1955 (Fed)

CA-11

ID-529N12_CA-11

0937
P.926

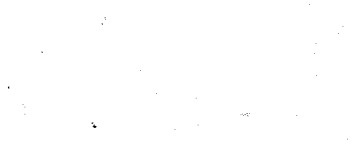

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

Pradip Sarbadhikari
Apr

732 N

PRESIDENCY COLLEGE
MAGAZINE
Vol. 36
1955

১৩৬১

সূচীপত্র

702N
1

বিষয়			পৃষ্ঠা
পত্রিকা-প্রসঙ্গ	...	...	১
কলেজ প্রসঙ্গ	...	...	৩
কবিতাগুচ্ছ			
নীলকান্না	...	...	৬
নানারঙের দিনগুলি	...	...	৭
কোরিয়ার মৃত্যুভীত বন্দীদের ছবি দেখে	...	...	৯
শার্ল বোদ্‌লেয়্যর অবলম্বনে	...	...	৯
একটি মেয়েকে জানি	...	...	১০
আমাদের নদীটিকে	...	...	১১
মাটি আর মানুষ	...	...	১২
তুমি, আমি, পৃথিবী	...	...	১৩
লটারি টিকিট (গল্প)	...	...	১৪
জীবনানন্দ ও বনলতা সেন	...	...	১৭
বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ	...	...	২৩
কাব্য ও দর্শনের উপযোগিতা	...	...	৩০
কেইন্‌সীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে	...	...	৩৭
'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি		...	৪৩
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না আধুনিক গান ?	...	...	৪৭
আমাদের কথা	...	...	৫১
Editorial	...	...	1
The Myth of the Welfare State	...	...	9
The English Revolution	...	...	15
The Quill and the Flute	...	...	20
Hamlet and Ophelia	...	...	26
Peaceful Co-existence	...	...	27
The Crisis of Britain and the British Empire		...	32
Electoral Procedure in our College	...	...	37
Sleep	...	...	42
Oscar Wilde and his Stories	...	...	45
The Valley of Paradise	...	...	48
The Meaning of the Middle Ages	...	...	54
Dr. Jogishchandra Sinha	...	...	62
The Alumni Association	...	...	67

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীসুনীতকুমার ইন্দ্র (সভাপতি)
" শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
" শ্রীঅমল ভট্টাচার্য
" শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুখময় চক্রবর্তী (সম্পাদক)
শ্রীপ্রদীপরঞ্জন সর্বাধিকারী (কর্মসচিব)

ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ

জন্ম : ২রা মে, ১৮৯৩।

মৃত্যু : ১০ই মে, ১৯৫৪।

093.7
708

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩৬১ :: ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ :: ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

পত্রিকা প্রসঙ্গ

উত্তরত্রিশ আত্মসমীক্ষণের পক্ষে বোধহয় উপযুক্ততম সময়। তখন দীর্ঘ ত্রিশ বছরের পটভূমিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ও বোধগ্রাহ্য রূপ পেয়েছে; আর তাই তা'কে ভিত্তি করে এবং প্রয়োজনমত তা'কে বর্ধিত, মার্জিত, এমন কি বর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে ভবিষ্যতের পথ নিরূপণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। অতীতবিশ্লেষণের সমস্ত সুফলটুকু পাওয়ার সময় এই উত্তরত্রিশ,—ইতিহাসের গুরুত্বটুকু রয়েছে যদিও অতীতের ভূত ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে তখনও নষ্ট করে দেয়নি। অতএব এইপত্রিকার ছত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে অতীত ইতিহাসের খানিকটা পর্যালোচনা নেহাৎ অবান্তর বলে মনে হয় না।

পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তদানীন্তন অধ্যক্ষ হেন্‌রি জেমস্ এই কলেজীয় পত্রিকার তিনটি বাঞ্ছনীয় গুণের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকা প্রেসিডেন্সিয় কলেজ-জীবনের একটি ধারাবিবরণী রক্ষা করবে এবং এইভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করবে। দ্বিতীয়তঃ এটি সমসাময়িক সমস্ত ছাত্রজীবনকে প্রতিফলিত করবে এবং এইভাবে একটি কলেজীয় পত্রিকা হিসাবে তার বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করবে। তৃতীয়তঃ এই পত্রিকা ভাষার মাধ্যমে বুদ্ধি ও বোধির স্ফুরণ ও সঞ্জীবনে সহায়তা করবে। এই তিনটি গুণ যদি কোন কলেজ পত্রিকার থাকে তাহ'লে সেটি অনিন্দিত না হোক বহুলাংশেই নন্দিত হবে এরকম আশা করা যেতে পারে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার পুরানো সংখ্যা পাঠান্তে কতকগুলো কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ 'কলেজ সংবাদ' বিভাগের সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এখানকার কলেজ-জীবনের যে ধারাবিবরণী এতদিন রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ততার দোষারোপ ঘটবার বিশেষ কারণ নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা তার কলেজের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেছে এরকম কথা বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার মান উঁচু এবং যে কোন পত্রিকার

গর্বের বস্তু ;.প্রবন্ধগুলো সর্বদা যদি বিশিষ্ট না-ও হয় সারগর্ভ নিঃসন্দেহে। কবিতায় সাধারণভাবে ভাবালুতার থেকে ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়, রস- ও রম্য-রচনায় অনাস্বাদিত রসের পরিবেশন যদি না-ও থাকে, স্বচ্ছতা ও গতির প্রসাদগুণে তারা সুখপাঠ্য। গল্পের বিভাগ অবশ্য তুলনায় দুর্বল কিন্তু নিন্দনীয় নয়। পত্রিকাটির রূপ প্রধানতঃ গুরু ও গম্ভীর কারণ বৃহদায়তন প্রবন্ধগুলো অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে এবং এ পত্রিকায় পরিবেশিত তরল রসে অলস বিশ্রামের ভঙ্গীই থাকে, চটুলতার কলঙ্কস্পর্শ ধরে না। সুতরাং এই পত্রিকা তরুণ মনীষার সুস্থ স্বপ্রকাশের সহায়ক ছিল ও থাকবে এরকম মনে করা যেতে পারে। তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য এই পত্রিকা সম্বন্ধে চোখে পড়ে তা' এর দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তি। এ কথার অর্থ এই নয় যে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একটা অন্তর্নিহিত ঔদ্ধত্যের ভাব একে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এর সুন্দর স্বকীয়তা এবং উচ্চ মান প্রেসিডেন্সির ছাত্রজীবনের এমনই মজ্জাগত যে এ নিয়ে সদাব্যস্ত ও সচকিত থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কথাটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্সির মেধা ও মন অনেক সময় এমনই একান্তভাবে 'academic questions'এ নিবদ্ধ হয়ে থাকে যে, বাইরের পৃথিবীর সংঘাতসংকুল জীবনের কোন সুস্পষ্ট ছাপ এর মধ্যে পড়ে না। একথা আশা করা আমাদের অন্যায় নয় যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়াও বৃহত্তর ছাত্রসমাজের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটবে এই পত্রিকার মাধ্যমে। শুধু ছাত্রসমাজ কেন, যে বৃহত্তর সমাজের ছোট ভগ্নাংশ এই ছাত্রসম্প্রদায়—তার সমস্যা, তার পথসন্ধানের কথাও থাকবে এর মধ্যে।

এ শুধু বৈচিত্র্য সম্পাদনের কথা নয়, শুধুমাত্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আলোচনার পরিধি বিস্তৃতির প্রশ্ন নয়, এমন কি সম্পূর্ণের কাছে অংশমাত্রের ঋণস্বীকৃতিও নয়—এ ফুল ও ফলের জন্যে মাটির বুক থেকে গাছের রস আহরণের প্রশ্ন।

আমরা যে কথা বলছি সে কথা ইতিপূর্বে বহুজন বহুভাবে বলে গিয়েছেন। তবুও একথা আরেকবার মনে করছি এইজন্যে যে আত্মসমীক্ষণে ও অতীতবিশ্লেষণে এই বিচ্ছিন্নতা ও সীমিত উপলব্ধি একটা প্রধান ত্রুটি বলে চোখে পড়েছে। উত্তরত্রিশে আত্মসমালোচনার প্রথম সুফলটি পাওয়া গিয়েছে—দ্বিতীয়টিকে অর্জন করে নিতে হবে; এ ত্রুটি সংশোধন করে নিতে হবে।

পরিশেষে, একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। এ পত্রিকা আমাদের এবং নিতান্তই আমাদের—আমরাই যন্ত্রী, এ নিতান্তই যন্ত্র মাত্র। আমাদের লেখায় আমরা যদি আমাদের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাপ্তি ও সন্ধান নিয়ে ফুটে না উঠি সে অক্ষমতা আমাদেরই। সুতরাং ত্রুটি নিরূপণের পর ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব নিতান্তই আমাদের। আমাদের সচেতন চেষ্টা ছাড়া ত্রুটি সংশোধনের পরিকল্পনা শুধুই আকাশকুসুম।

কলেজ প্রসঙ্গ

কলেজে পরিবর্তন

অন্যান্য বৎসরের মত এবৎসরেও কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে যথারীতি পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারী চাকুরীর বাঁধা নিয়মানুযায়ী স্থান পরিবর্তন, অবসর গ্রহণ কিংবা প্রবাসযাত্রা—মূলতঃ এইসব কারণে আমাদের অধ্যাপকদের কেউ কেউ এই কলেজ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপকপ্রধান ডাঃ মনোমোহন ঘোষ অবসরগ্রহণ করায় তাঁর স্থান পূর্ণ করেছেন এ কলেজেরই অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী। হুগলী মহসীন কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী সম্প্রতি আমাদের কলেজে যোগদান করেছেন। এ বিভাগেরই অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাস সম্প্রতি কুচবিহার কলেজের বাংলার অধ্যাপক হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁর স্থানে ডাঃ অমলেশ ত্রিপাঠী কার্যে যোগদান করেছেন।

গণিত বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু কাজে যোগ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত বসু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্ উপাধি লাভ করেছেন। গবেষণায় সাফল্য অর্জন করায় আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দার্জিলিঙ্ সরকারী কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রভাকর সেন সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক হিসাবে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন।

রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার সিংহ ফুলব্রাইট বৃত্তিলাভ করে উচ্চতর গবেষণার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। আমরা আশা করছি তাঁর গবেষণামূলক কার্যাবলীতে আমাদের কলেজের রসায়ন বিভাগের মর্যাদা বর্ধিত হবে। এই বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুবাসকুমার ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্ উপাধি লাভ করেছেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করছি। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীদয়ানন্দ ভাদুড়ী কৃষ্ণনগর কলেজে স্থানান্তরিত হয়েছেন। তাঁর স্থানে এসেছেন হুগলী মহসীন কলেজের শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত। এই বিভাগের কর্মী শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী পদত্যাগ করেছেন ও শ্রীশিশিরচন্দ্র রক্ষিত নতুন কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছেন। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীশ্যামাশংকর ভট্টাচার্য কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি পেয়েছেন।

শারীরবৃত্ত বিভাগের শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কাজে যোগ দিয়েছেন

এ বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পদার্থবিদ্যাবিভাগের শ্রীসরোজবন্ধু সান্যাল, রসায়ন বিভাগের শ্রীশিশিরচন্দ্র রক্ষিত ও শারীরবৃত্ত বিভাগ থেকে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় ডি. ফিল উপাধি লাভ করেছেন।

এঁদের সকলকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাধান্য অবিসংবাদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা অনেকেই আমাদের কলেজের ছাত্র। অতীতের মত বর্তমানেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরীক্ষার খাতায় আমাদের ছাত্ররা যথারীতি তাঁদের সর্বাগ্রগণ্যতা বজায় রেখেছেন। আই. এ ও আই. এস্‌সি পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ৮৮·৫৪% ও ৯৫·৫%।

বি. এ ও বি. এস্‌সি পরীক্ষাতে পাশের হার নিম্নক্রম—৮৪·৪৮% ও ৭৫·১৮%। বি. এতে মোট ১১ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন। বি. এস্‌সি পরীক্ষাতে মোট ২২ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছেন।

এই বৎসরের বি. এ পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সম্মান ঈশান বৃত্তি লাভ করেছেন ইতিহাস বিভাগের ছাত্র শ্রীসুধীর পাল। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে একাদিক্রমে গত তিন বৎসর ইতিহাস বিভাগের ছাত্ররাই এই সম্মান পেয়ে আসছেন। •

আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅমর্ত্যকুমার সেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ট্রাইপোসের প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের পক্ষে এই ধরণের সম্মান বহুদিন পরে এই প্রথম। শ্রীসেনকে আমরা তাঁর সাফল্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ শতাব্দী উৎসব

১৯৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের একশত বৎসর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষ্যে কলেজে সমারোহের সঙ্গে শতাব্দী উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আয়োজন কলেজ কর্তৃপক্ষ ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংসদ করছেন। অন্যত্র পত্রিকার ইংরাজী বিভাগে আমরা প্রাক্তন ছাত্রসংসদের কার্যাবলীর একটি বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করছি। শতাব্দী উৎসব সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য সেখানে পাওয়া যাবে।

শোক-সংবাদ

এ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজ তার কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রকে হারিয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমাদের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহের দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক বিশেষ প্রতিভাবান সন্তানকে হারাল। ডাঃ সিংহের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকপ্রধান হিসাবে তিনি এদেশে অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচনার পথ বহুলাংশে সুগম করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এ সংখ্যায় আমরা তাঁর সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ প্রকাশ করছি।

ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্তের মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ব্যথিত হয়েছি। তিনি এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রসংসদের আজীবন সদস্য ছিলেন। আইন কলেজের সঙ্গে তিনি বহুকাল অধ্যাপক হিসাবে জড়িত ছিলেন। খেলার জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠ। আই. এফ. এ.র প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ একটি দরদী বন্ধুকে হারাল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু আমাদের পক্ষে বিশেষ দুঃখের সঞ্চার করেছে। তিনি এই কলেজের একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন।

ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীপ্রণয়কুমার দাস ও চতুর্থ বর্ষ অর্থনীতির শ্রীহিমাংশু চন্দের অকালমৃত্যুতে আমরা বিশেষ ব্যথিত বোধ করছি। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কবিতাগুচ্ছ

নীল কান্না

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত—ষষ্ঠ বর্ষ, কলা

জানে না কেউ কেমনে দিন কেন যে চলে যায়,
কালের পাখি কেন যে যায় ঝরা পালক তার
ঝরিয়ে নীল চিন্ময়তার সিন্ধু-মোহানায়।

অতীত নিয়ে বিশ্বপ্রাণের নীলিম হাহাকার
বাসন্তিকার আঁচল-পাতা আকাশ-মাঠ ঘুরে
আকাশ-ছোঁয়া সোণাসবুজ প্রান্তরে সন্ধ্যার।

অভিজ্ঞান ছড়িয়ে যায় শিশির-ঝরা সুরে,
চাঁদের হলুদ চেরাগ জেলে সময় ছোট হয়ে
লক্ষ হৃদয় ছেড়ে শুধু দু'টি হৃদয় জুড়ে

অপরূপের নূপুর বাজায়, সৃষ্টি যে-সময়ে
কান্না ছেড়ে সব-পেয়েছির সুর চুপে নেয় সেধে,
তারপর সে আবার প্রাচীন নীলিম ব্যথা বয়ে

চলে আরেক আকাশ পানে, মানুষ কেন বেঁধে
রাখতে চায় সময়-দেশ-সন্ততিকে, হায়
পুরুরবা মরছে কেন মরছে আজো কেঁদে,—

সোণালি হাঁস কুলায় ফেরে নীলাভ সন্ধ্যায়॥

নানারঙের দিনগুলি

শিশিরকুমার দাশ—চতুর্থ বর্ষ, কলা

১

রাত্রি কখন গভীর হবে এই আশাতেই থাকে
আলোর মাঝে কী লজ্জা তার, লজ্জাতে মুখ ঢাকে—
ঘুমিয়ে পড়ে সবাই কখন, আর কত যে দেরী
এই ভাবনায় কাল কেটে যায়, বন্ধ ঘুমের ফেরী!
আঁধার এসে মূর্চ্ছিত হয় অশ্রুসাগর জলে
প্রাণের হাওয়া থমকে দাঁড়ায় জীর্ণবটের তলে
বল্‌না কি চাস্, স্বপ্নে এসে বললে হাজার হাওয়া
ঘুম ভেঙে যায়,- ঘুম ভেঙে যায়, হয়না কিছু চাওয়া।

বিছানাতে গুমরে মরি সমস্তটা রাত
দে আমাকে একটা কিছু, একটা ঘুমের হাত
একটু শুধু টুক্‌রো আকাশ, জান্‌লাটুকু খোলা
সকালবেলায় রক্তজবা, কান্নাহাসির দোলা।
অন্ধকারেই লুকিয়ে ছিল এই আশাতেই থাকে
কামনাটা কখন আমায় জ্বালবে পাকে পাকে
ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের ওপর কোথার থেকে এসে
তবু কুশল শুধোতে হয় শুক্‌নো হাসি হেসে
হঠাৎ তারা লুটিয়ে পড়ে হারাই আমি দিশে
বুক চিরে দেয়, বুক চিরে দেয়, নগ্ন নখের বিষে।

দগ্ধ দেহে চেঁচিয়ে উঠি সইবনারে নারে
পেরিয়ে গিয়ে দুঃখ আমায় যেতেই হবে পারে।
শপথ নিতেই বিষণ্ণ মন চমকে যেন ওঠে
সারা মাঠের হাল্‌কা হাওয়া বুকের 'পরে লোটে।
সেই হাওয়াতে কোথায় হারায় সারা রাতের হাসি—
আয় না জীবন নতুন করে তোকেই ভালবাসি।

২

অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠি দরজাটুকু খোলনা এবার
রাত্রিশেষে সময় এলো হৃদয়খানি ছড়িয়ে দেবার
সমস্ত মন কঁকিয়ে ওঠে : আজকে হলাম ধন্য আমি
হৃদয় থেকে ভোরের আলোয় আজ যেন কে জন্ম নিল
এই আবেগে সামনে এসে আবার ডাকি, আবার থামি
ভোরের আলোয় সমস্ত মন নদীর মত উচ্ছলিল
খুল্‌বিনা দোর খুলবিনা মন মেলবিনা তুই আঁখি
অনেক আলো, অনেক হাওয়া পড়বে যে রে ফাঁকি।
যন্ত্রণা আজ বীণার তার।
জাপ্‌টে ধরা অন্ধকার—
সেই ঘৃণাতে কাঁপিস্‌নে মন আজকে আর
হাসবে যারা হাসুক তারা দুয়ারে আজ তাহার নাড়া
তারাই যে কাল ভোরের মত আবার দেবে নূতন সাড়া।
যন্ত্রণা, মন, তবুও আশা, তবুও আলো তাইত স্বামী
সমস্ত মন তোমাতে ধায় তোমায় বলে ধন্য আমি ॥

৩

একটা কোমল সুর জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
কখনও সকাল হলে কখনও বা অলস সন্ধ্যায়।
একটি বিষণ্ণ মন তাকে ভেঙে দুধারে ছড়াই
সহস্র কাজের মাঝে কখন সে হয়ে যায় লীন
কখন আড়ালে জ্বালা, জ্বলে জ্বলে হয়ে আসে ক্ষীণ
আমার প্রসন্ন ভোরে, চলে শুধু অন্নের লড়াই।
অজস্র কুকুর ডাকে আর্তনাদে বিদীর্ণ আকাশ
তবুও দেহের রক্ত সে ক্ষুধায় জানাল উচ্ছ্বাস।
অবসন্ন রাত্রে শুধু চেয়ে দেখি খোলা জানালায়
অসংখ্য তারার চোখে আকাশেরা সবিস্ময়ে চায়
আরো দেখি মুছে যায় পৃথিবীর সেই রক্তজমা—
রূপ, আর দেখা দেয় শান্তপক্ষ সিত বিহঙ্গমা—
মনে হয় জীবনকে ছুঁয়ে গেল একখানি গান
যদিচ ভোরের রৌদ্রে রাত্রির স্বপ্নেরা খান খান ॥

কোরিয়ার মৃত্যুভীত যুদ্ধ বন্দীদের ছবি দেখে

অসিতকুমার—প্রাক্তন ছাত্র

বিরুদ্ধ বিকৃত মুখে আমাদের ব্যর্থতা মাখানো
মিথ্যা ও মৃত্যুর জয়, ঘোষে ঐ অশ্রুরুদ্ধ স্বর।
নিত্য বিশ্ববঞ্চনার যূপকাষ্ঠে মুগ্ধ বলি আনো—
ইতিহাসে থেকে গেল পরাজয়ে ক্লেদাক্ত প্রহর।

শাশ্বতের কথা থাক্। আমাদের ক্ষণিক বিশ্রাম—
জন্মজনতার মাঝে জেগেওঠা ক্ষণমত্ত ঢেউ,
তার-ই মাঝে পৃথিবীকে, সব দিয়ে,—ভালবাসিলাম।
সে প্রেম শ্মশান হ'ল। তার গান গাবে নাকি কেউ?

আমাদের প্রাণ দোলে, মরণের কঠিন কৌতুকে,
নানা রং জ্বলে ওঠে বর্ত্তমান বুদ্বুদের বুকে,
মানুষের রক্ত দিয়ে শূন্যতার সহস্র স্বাক্ষর—
লিখে আর মুছে ফেলে, মহাকাল কি বিষাক্ত সুখে!

বারে বারে ঝরে যাবে, মানুষের অসহায় আশা?
কালের মন্দিরে জ্বলে—আমাদের ক্ষুধিত জিজ্ঞাসা।

"শার্ল বোদ্‌লেয়্যর অবলম্বনে"

সুরজিৎ দাসগুপ্ত—প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান

কখনো প্রতিষ্ঠা করি দীপ্ত প্রেমে। কখনো হেলায়
চূর্ণ করি প্রতিমাকে; যৌবনের স্বপ্নে পুনরায়
কখনো বা গড়ি তাকে। সমুদ্রের বিকীর্ণ বেলায়
শিশুর মত এ খেলা বালু নিয়ে। সে আমার নয়।

বাতাসে সংক্ষুব্ধ কোনো দুর্যোগের রাত্রি তার চুল।
যেন তার ভ্রূরেখায় সর্বনাশ জ্বলে অনুবেল।
দেবীর আসনে রাখি। দূরে রাখি চৈত্রের বকুল
উপহার আনি, অন্ধ-হৃদয়ের সংশয়ে উদ্বেল।

মর্মের মন্দিরে যার বিম্ববুকে স্বপ্নের চারণা ;
নির্মম বধিরা সেই নারী কিংবা দেবী দূরযানী।
চিরকাল ব্যথা পাবো তাকে ভেবে, তবু ভুলবোনা
যে সে-নাম উচ্চারণে বিধৃণিত প্রেরণার বাণী।

অসহ সে। কঠিন সে। তবু তার কুন্দনিভ মুখ
হৃদয়ে বহন করে প্রত্যহই হই নিরুদ্দেশ,
চিরকাল ব্যথা পাবো তাকে ভেবে। তথাপি উন্মুখ
চেতনার মণিকক্ষে নিত্য তার অবাধ প্রবেশ।

চোখে তার অমাবস্যা। চুলে তার দুর্যোগের রাত।
তার সাহচর্যে কাঁপে প্রত্যাসন্ন ঝড়ের উদ্ভাস।
আঙুলে ধ্বংসের নেশা আনে তার চম্পকের হাত।
বিকীর্ণ বীক্ষণ তার জন্ম দেয় অমোঘ বিশ্বাস।

আকাশের রঙে তবু অন্ধকার করে আনাগোনা।
চিরকাল ব্যথা পাবো তাকে ভেবে, তবু ভুলবোনা॥

একটি মেয়েকে জানি

জয়চরণ সরকার—২য় বার্ষিক শ্রেণী (কলাবিভাগ)

একটি মেয়েকে জানি, সকালে যে কাক ডাকার আগে
অসীম ক্লান্তিকে নিয়ে ঘুম হতে জাগে,
ভোর তার ধোঁয়া ঢাকা
কয়লার কালোকালি মাখা।
সকালে কাজের গতি তীব্রতর ঘড়ির কাঁটায়
একছুটে পার হয়, সাড়ে ন'টা বাজলে দাঁড়ায়
অসহ্য ভীড়ের ট্রামে,
তারপরে একেবারে থামে
টেবিলের পাশটিতে শিরদাঁড়া ব্যথা করা সারাটা দুপুর ;
সেখানে তোলে না তাল দিনের নূপুর।

বিকেল পড়েনা চোখে, কালো মুখে চোখের কালিতে
ঘামে ভরা শ্রান্তি, তবু দিনের বালিতে
থামে না কাজের স্রোত, বকে যেতে হয় একটানা
নির্বোধ ছাত্রীর প্রতি, ইতিহাস-ভূগোলের দেনা।

তারপরে ঢের রাতে ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরে এসে
শুয়ে পড়ে শেষে।
চোখে তবু আসে না তো ঘুম
চারপাশে সীমাহীন রাত্রিও নিঝুম।
চেয়ে দেখে অপলক, দূরে কালো আকাশের তলে
সবুজ সবুজ তারা শুধু মিট মিট করে জ্বলে।
ওরা কি বলেছে তাকে, সে কথা আমাকে বলেনি সে ;
জানি সেই কথা আছে এ রাত্রির আকাশেতে মিশে।
তাই আমি সারা দিনে আঁধার রাতের কাল গুনি,
বুকভরে, কানভরে, শুধু তারাদের কথা শুনি।
সে তারা বলেছে তাকে ডেকে,
'কালের প্রহরী আমি এসেছি অনেক কিছু দেখে।
তবুও আমারও আয়ু ফুরোবেই জানি একদিন,
শুকতারা আসবেই সাথে নিয়ে প্রভাত নবীন।
স্বর্ণাভ হাসিটি তার তোমারও বুকে ছোঁয়াবে সে ;

ধোঁয়া নয়, ক্লান্তি নয়, সোনালি সকাল ওঠে হেসে'॥

আমাদের নদীটিকে

প্রদ্যুম্ন মিত্র তৃতীয় বর্ষ, কলা

তোমাতে বিশ্বাস রাখি এই জলে, তুমি কে আমার
মাতা নয় সখি নয় তুমি এক পুরোনো আলাপ
প্রাচীন বটের মতো এই মন বলে বার্‌বার্‌
জল মাখো জল নাও কুড়িয়েছি হিমহিম তাপ
শরীরে শিরায়, আর ধান হাসে মাটি নীল যদি
সবিতো নদীর জল হাওয়া নিয়ে—

আছে আছে নদী
আজ আর চিনবেকি তাকে ! ভাবো দেখি ইতিহাস
সাতগাঁও তমলুক থেকে হাওয়া নড়ে, হাওয়া না নিঃশ্বাস,
মাস্তলের ভাঙা আর দড়িদড়া হাল ছেঁড়া পাল
কোথায় মাতাল ঢেউ মাথাভাঙা আথাল পাথাল !!
দুপাশে কঠিন চূড়ো গ্রাম জলে দুপায়ে শেকল
আমার নদীকে বলি, কথা বলো, চোখে তার জল।
আহা নদী, তাকে পেতে হবে তবু জল দেবে প্রাণ
আমাকে বিশ্বাস করো নদি, তুমি গাইবেই গান ॥

মাটি আর মানুষ

শ্রীগৌরীশঙ্কর দে—ইতিহাস, ৩য় বর্ষ

রোজ ব্যবহারে বাসি শহরের বাঁধাপথ ছেড়ে
ঢের পথ পিছু ফেলে এলে শুনে তার স্বাগতম
সে গ্রাম-রূপসী আজো ভয় পায় হতে আধুনিক,
এখনো, এখনো যেন মানুষের হৃদয়ের রেশ
সন্ধ্যা তারাটিতে মেলে, নুয়ে পড়া-বাবলার ডালে,
অযত্নবর্দ্ধিত ঝোপে, শিরীষের ঝরা রাঙা ফুলে।
চেয়ে নিয়ে চুপি চুপি বৈরাগী সন্ধ্যার নামাবলী,
গায়ে দিয়ে খুসী মনে মাটীতে হাজার ঢেউ গোনা
যে সব অনন্ত ঢেউ লিখে গেছে লাঙ্গল-জাহাজ,
অথবা হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের স্মৃতি মধু পান।
জোনাকীও নেই বলে মনে হবে যে দূর ওপারে
মাঝে মাঝে দেখা যাবে দু'একটি জলে উঠা দীপ
নিভে গেলে ভেসে রবে সরল পুরানো কীর্তনের
কানে এসে মন-হৃদে দু' একটি অন্তরঙ্গ কলি।
মাটিকে মায়ের মত মনে হবে, মনে হবে তারি কাছাকাছি
মাটির মানুষ ছিল, আজো তারা মাটিরই মানুষ !

তুমি, আমি, পৃথিবী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন ছাত্র

ঘড়ির কাঁটার মত ছুঁই সব ঘর
অনেক বছর দিন সময় প্রহর :
রৌদ্র যায় জ্যোৎস্না আসে
মেঘ ভাসে চাঁদ ভাসে
হাজার বনের হাঁস উড়ে উড়ে যায়
গানের হাজার কলি আকাশের গায় ;

তারপরে ভোর হলে শিউলি ঝরার
মালা গাঁথা হয় কথা অযুত ছড়ার—
"ভালবাসি তুমি আমি এই বালুচর
এইখানে বাঁধি এসো দুজনের ঘর—

কৃষ্ণচূড়া ঝরে যদি দুপুরে বিকেলে
আকাশে চিলের রাশি বৃত্ত এঁকে গেলে
আলোছায়া তবে জেনো আমাদের মাঠে
ঘন নীল শান্তি ঢালে হৃদয়ের ঘাটে ;

তখন বইবে হাওয়া উড়ে যাবে পাখি
আকাশে আকাশে ঘুরে কেবল একাকী
প্রেম চায়, আলো চায় যদি শাদা চাঁদ
ছোট তার মুখটিতে রাখে দুটি হাত !

ঘড়ির কাঁটার মত পৃথিবীকে ছুঁয়ে
হে প্রেম বাঁচিয়ে রেখো বিদেশ-বিভুঁয়ে
অনেক সময় গেলে দেখি যেন ফের
তুমি আছ, আমি আছি, পৃথিবী নিজের।"

লটারী টিকিট

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—চতুর্থ বর্ষ, কলা

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর আইভ্যান ডিমিট্রিচ খবরের কাগজটা নিয়ে বসলো। ডিমিট্রিচ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মাসে তার আয় একশো টাকার বেশী নয়। টাকা-পয়সায় লোভ তার নেই। নিজের যা আয় তাতেই সে সন্তুষ্ট।

কাগজটা সে সবে খুলেছে, এমন সময় তার স্ত্রী বললে—আজ আমার কাগজটা একেবারেই দেখা হয়নি। লটারীর প্রাইজের লিস্টটা বেরিয়েছে কিনা দেখ তো?

ডিমিট্রিচ বললে—হ্যাঁ বেরিয়েছে তো দেখছি। তোমার টিকিটটার সময় বোধহয় উৎরে গেছে।

—না মঙ্গলবার পর্যন্ত আছে।

—নম্বরটা মনে আছে নাকি?

—সিরিজ ৯৪৯৯, নম্বরটা হচ্ছে ২৬।

—আচ্ছা দেখছি।

লটারীর ওপর ডিমিট্রিচের কোন কালেই আস্থা ছিল না। উইনিং নাম্বার্সের লিস্টটা দেখতে তার কোন আগ্রহই হোত না। তবুও স্ত্রীর অনুরোধে কর্মহীন অবসরে সে লিস্টের নম্বরগুলো তলা থেকে পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে তার চোখ যখন প্রায় লিস্টের ওপর দিকে চলে এসেছে, তখন হঠাৎ সিরিজ ৯৪৯৯ দেখে সে চমকে গেল। প্রথমে তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলে না। নম্বরটা না দেখেই সে বললে,

—আরে এইতো ৯৪৯৯—এইটাই তুমি বললে না?

ডিমিট্রিচের বিস্মিত চাহনি দেখে তার স্ত্রী বুঝলে ডিমিট্রিচ ঠাট্টা করছে না। তবুও বললে—সত্যি রয়েছে নাকি—না ঠাট্টা করছো?

—আরে এই দেখ না।

ছোট ছেলের সামনে যদি কোন চকচকে জিনিস রাখা যায় তাহলে তার মুখ যেমন আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক সেই রকম ঔজ্জ্বল্যে ভরে উঠলো ডিমিট্রিচের মুখ, তার স্ত্রীর আনন্দ অবর্ণনীয়। পঁচাত্তর হাজার টাকা তাদের কপালে নাচছে। ৯৪৯৯—আর ৭৫০০০—এই দুটো সংখ্যাই তাদের মন জুড়ে বসলো।

ডিমিট্রিচ খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করে দিলে। —"ওঃ একটা নূতন জীবন পাওয়া যাবে; আমি যদি এ টিকিটটা পেতাম (টিকিটটা তার স্ত্রীর নামে) তাহলে প্রথমেই ২৫ হাজার টাকার একটা জমিদারী কিনে ফেলতাম।

১০ হাজার নিজের খরচ, দেনাশোধ, বেড়ানো ইত্যাদির জন্যে রাখতাম। আর বাকি ৪০ হাজার ব্যাঙ্কে জমালে তা থেকে সুদ পাওয়া যেত।"

ডিমিট্রিচের স্ত্রী বললে—হ্যাঁ একটা জমিদারী তো আগে কিনতেই হবে।

নানা অভাবিত কল্পনায় সমুচ্ছলিত হয়ে উঠলো তাদের মন। এই সব কল্পনার মধ্যে যেন যৌবন ফিরে পেলে ডিমিট্রিচ।···'গরমের দিনে ঠাণ্ডা সুপ খেয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।···তারপর ঝরণার ধারে বালির উপর, কিংবা কোন গাছের তলায় শুয়ে পড়লো। তার ছোট ছোট ছেলে আর মেয়ে তার আশে পাশে বালি খোঁড়ে আর মখমল-পোকা ধরে। ডিমিট্রিচ শূন্য মনে ঢুলতে থাকে।'···আজ···কাল···আর কোনদিনই তার আপিস নেই। কোনদিন হয়তো শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে পড়বে আর বিচিত্র রহস্য তাকে ঘিরে নীড় রচনা করবে। কোনদিন হয়তো শুয়ে শুয়ে তার একঘেয়ে লেগে গেছে, তাই সে পা বাড়ালে সবুজ ঘাসের সমারোহ-স্নিগ্ধ প্রান্তরের দিকে। হয়তো বা বিজন বনের হাতছানি তাকে আকৃষ্ট করলে···হয়তো বা সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের মাছধরা দেখতে লাগলো।···সূর্য যখন পাটে বসেছে তখন সে সাবান ও তোয়ালে নিয়ে স্নান করতে গেল। মনের আনন্দে সাবান মেখে জলে নামলো। চারিদিকে জ্যোৎস্নার ফিনিক্ ফুটেছে—স্বচ্ছ জলে সোনালী মাছেরা স্বচ্ছন্দ বিহার করছে—শ্যামল শৈবাল জলস্রোতে কাঁপছে। স্নান শেষ করে বাড়ী এসে ক্রীম দুধ আর চা খেলে। তারপর সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরলো···কিংবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপে মত্ত হল।···'

ডিমিট্রিচের স্ত্রীর মনও উধাও হয়েছে সব পেয়েছির দেশে। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় মন ও জীবনের মালিন্যরেখাগুলো সব ধুয়ে মুছে কোথায় চলে গিয়েছে।

ডিমিট্রিচ বর্ষণমুখর শরতের কল্পনা করে। শরতে সে বাগানে কিংবা নদীর ধারে বেড়াতে যাবে। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে এসে একগ্লাশ মদ পান করবে। তখন শোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ছবির ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে ওলটাতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।···কিন্তু কুশ্রী মেঘলা দিনের চিন্তাও তাকে বিরক্ত করে। বাড়ী থেকে বেরবার উপায় নেই—কেবল ঘরের ভেতর পায়চারি করা।···

হঠাৎ ডিমিট্রিচ তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে—'বুঝলে, টাকাটা পাওয়ার পর কোথাও বিদেশে যেতে হবে।'···আবার তার মনে ভিড় করে এলো দূর দূরান্তে ভ্রমণের অপূর্ব সব চিত্র—ফ্রান্স,···ইটালী,···গ্রীস···ভারত···দূর বিদেশে পাড়ি জমানোর মধ্যে কি বিচিত্র আনন্দের ছন্দ দোলায়িত হয়ে আছে।

ডিমিট্রিচের স্ত্রী এবার বললে—'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ডিমিট্রিচ পায়চারি করে আর ভাবে···তার স্ত্রীও যদি সঙ্গে যায়। একা বেড়ানো কত ভাল, কত লোভনীয়। ও কেবল একগাদা বাক্স পেঁটরা পোঁটলা-পুঁটলি গাড়ীতে ওঠাবে। যেখানেই যাবে সেখানেই জিনিস নামাতে ওঠাতে প্রাণান্ত। তার ওপর বলবে—ট্রেনে

আমার মাথা ধরে যাচ্ছে,…বড্ড খরচ হয়ে যাচ্ছে। এক একটা স্টেশন আসবে আর তাকে ছুটতে হবে খাবার আর গরম জল আনতে। এতেই তো জীবনের অর্ধেক ক্ষয়িত হবে।'

স্ত্রীর দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে আবার সে ভাবতে লাগলো—'আমি খরচ করলেই ওর কেবল হিংসে আর রাগ। টাকাটা তো আর আমি পাচ্ছি না। ওতো হিংসে করবেই। দূরে বেড়াতে যাবার ওর কি দরকার! ওর অনুযোগ—অভিযোগ শুনতেই দিন কেটে যাবে—আমার বেড়ানো হবে না। যা দেখছি টাকাটা এলেই বাক্সবন্ধ হবে। আমাকে ওর ওপর নির্ভর করতে হবে—কী আপদ্।'

আত্মীয়দের কথা মনে পড়লো ডিমিট্রিচের। লটারীর টিকিটে টাকা পেয়েছি শুনলেই যত হতভাগা ভাইবোন, খুড়ো খুড়ী—সব এসে জুটবে। কেবল দাও, দাও, আর দাও। তোয়াজের ঠেলায় বাড়ীতে তিষ্ঠতে দেবে না। অমনি সব ছোটলোক।

অজ্ঞাতসারেই দাঁতে দাঁতে ঘষতে থাকে ডিমিট্রিচ।

স্ত্রীর ওপরও তার ভয়ানক রাগ হল, টাকা পয়সা সম্বন্ধে কি জ্ঞান আছে ওর? কিছুমাত্র নেই কেবলই চাবি দিয়ে কৃপণের মতো পুষে রাখবে! একটা ঘৃণা আর ক্রোধের ভাব মূর্ত হয়ে উঠলো ডিমিট্রিচের মুখে। স্ত্রীর দিকে সে তাকালে।

দেখলে, তার স্ত্রীর মুখেও ঘৃণার ভাব ফুটে উঠলো। সেও ভাবছে—টাকাগুলো আসবে, অমনি ও হড় হড় করে খরচ করবে। যা যা ভেবেছিলাম, কোথায় উঠে যাবে কে জানে। পরের পয়সায় নির্ভর করে দিবাস্বপ্ন দেখতে কার না মজা লাগে।

ডিমিট্রিচের স্ত্রীর ওপর রাগ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। হঠাৎ তার কি মনে হলো, কাজ-কর্মরত স্ত্রীকে রীতিমত বিরক্ত করার জন্যে উইনিং নাম্বার্সের লিস্টটা অস্বাভাবিক রকম চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে ওদের সেই সিরিজ আর নম্বরটা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো—

"সিরিজ ৯৪৯৯, নম্বর ৪৬—আরে এযে ৪৬, ২৬তো নয়।"

পরক্ষণেই ডিমিট্রিচের মন থেকে সমস্ত আশা-ভরসা উধাও হয়ে গেল। স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা আর রাগ কোথায় ছুটে গেছে। তার স্ত্রী কর্মে বিরত হয়ে চেয়ারে বসে রইল। তাদের মনে হতে লাগলো ঘরটা ছোট্ট আর অন্ধকার হয়ে আসচে—ছাদটা যেন ক্রমশঃ নীচে নেমে আসছে—সন্ধ্যায় যা খেয়েছে তা যেন হজম না হয়ে বিদ্রোহ করছে। রাত্রিটা যেন অতি দ্রুত গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে—শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছে—একটা অবসাদ—একটা ক্লান্তি—মনটা যেন ঘুমিয়ে আসছে।

কোন অর্থ হয়, ডিমিট্রিচ ভাবে, ছি ছি, ছি, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে।

ডিমিট্রিচের বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছিল। কোন রকমে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না চেপে মুখটা বিকৃত করে সে চেয়ারে বসে পড়লো অত্যন্ত অবসন্নভাবে সুগভীর হতাশা নিয়ে।

* চেখফের 'দি লটারী টিকিট' গল্পের ভাবানুবাদ।

জীবনানন্দ ও বনলতা সেন

প্রদ্যুম্ন মিত্র—তৃতীয় বর্ষ, কলা

গ্রহণের গঠন কি পাঠের শৈলী লোকে লোকে ভিন্ন। কবিতার কাছে প্রকৃত বুদ্ধি-গ্রাহ্যতা কতখানি সার্থক পুরোনো শতক আর সাময়িককালের সমালোচকেরা তার হিসেব করে আমাদের শতাব্দীর মধ্যবয়সেও কোনও স্থির ফলাফলে পৌছতে পারেননি। এ পর্যন্ত আমরা বলতে পারি সমালোচনা চিরকালই ব্যক্তিগত এবং অনুভবের চরিত্র প্রকৃতি-পার্থক্যেই সূচিত।

যাক্, এ আলোচনা বনলতা সেনকে কেন্দ্র করে জীবনানন্দের যদি কোনও কাব্যভূমিকা হয়ে ওঠে, তবে খুশি হওয়া যাবে। ক্রমান্বয়ে তাঁর ভাষা, চিত্রকল্প, প্রকৃতি পৃথিবী ও কাল-চেতনা নিয়ে আলোচনার পর আমরা বনলতা সেনে পৌছাবো, অবশ্য গোড়াথেকেই সহৃদয় পাঠকের মতোই শুধু।

চলন যে ভাষার তার সঙ্গে কবিতার ভাষার তফাৎটাই বড়ো। দেশকালের বড়ো কিছুর জন্যে বেদনা আর মুক্তির আর্তি এবং একইকালে দেশকালে প্রকাশের আততি কবিতার মধ্যে কি শিল্পকলার অন্যান্য ধরণেও এই কথাটি স্পষ্ট। সৃষ্টির মূলে এই দ্বৈতযন্ত্রণা এই আপাতবৈপরীত্যের অন্বয়। ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি নানা চেহারায় ভাষার বদল ঘটেছে সময়ে কি যুগে সাহিত্যে এই কাব্যানুভূতির প্রকাশের গরজে। বদলটা বহুলাংশেই বক্তব্যের কারণে। আমাদের সাহিত্যে জীবনানন্দ যে কথা বলেছেন তা কোন একটা ধরণের বিকাশ নয়, আগাগোড়াই অভূতপূর্ব, অনেকটা আকস্মিক। তাঁর হাত থেকে যে বিশিষ্ট ভাষা পেলাম তা সম্ভবতঃ একদিনে নয়। ঝরাপালক আর সাতটি তারার তিমিরের তুলনায় একটি সিদ্ধান্ত নিঃসন্দিগ্ধ আর নিশ্চিত যে প্রকাশশৈলীর দিকে উদাসীনতা জীবনানন্দের ছিলোনা। তাঁর ভাষার ধরণ ক্রমশ পালটেছে এবং শেষ পর্যন্ত একটা কাম্যশৈলীতে এসে আশ্বস্ত। এ ভাষার প্রধান লক্ষণ এর ইন্দ্রিয়বেদন, স্বপ্নাভাস আর মায়াবী আচ্ছন্নতা। অবশ্য মাঝে মাঝে রচনায় আমরা বিভীষিকার তীব্রতায় অস্থির হয়েছি, 'তাহা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালিঘায়ে', 'হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতর' বা চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মত—ঘুমে-ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে' প্রভৃতি পংক্তিতে আমি পেয়েছি বিভীষিকা আর তার রচনার সুদক্ষতা। জীবনানন্দের ভাষায় প্রায়ই আছে কঠিনচমক যে সব মুহূর্তে আমরা প্রায়ই বুঝতে পারি এক বুদ্ধিজীবী স্পর্শসতর্ক ব্যক্তিত্বের অবস্থিতি সবকিছু স্তব্ধতা আর শূন্যগর্ভের আড়ালে। 'লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব করে ফেলে ফাঁস', 'আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে' এই ধরণের কথাবার্তা 'সাতটি

তারার তিমিরে' প্রচুর। এক উদাসীন ব্যংগে পৃথিবী আর প্রাণের নানা অসংগতিগুলোকে দেখার প্রয়াসে এইসব অসংলগ্নতা প্রায়ই উদ্দেশ্যময় এমন কি বিধেয়। অচৈতন্য দারুণ চমকে উঠেছে এইসব বক্তব্যের কাঠিন্যে এবং অভিধার অন্বেষায় অগ্রসর হতে চাইলো, হয়তো সেখানেই সার্থকতা।

জীবনানন্দের চিত্রকল্পগুলি প্রায়ই শারীরিক। শিশিরের শব্দ, রৌদ্রের গন্ধ, সুস্বাদ অন্ধকার, শব্দহীন জ্যোৎস্না, কুয়াশার পাখনা ইত্যাদি চিত্রকল্প সব পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভবের একটা সংকরী প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে যেন। দৃষ্টির সংগে শ্রুতির কখনো আঘ্রাণ আস্বাদের যোগ হোলো। কখনো প্রকৃতিতে আরোপ করা হয়েছে শারীরিক প্রক্রিয়া। 'এখন প্রশান্তমনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ, বাতাস ঝাড়িছে ডানা, শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে।' যে কোন সতর্ক পাঠকই এই লক্ষণগুলি আবিষ্কার করতে পারেন। ভাষার ভংগিমা আর চিত্রকল্পের বিশিষ্টতা জীবনানন্দের পার্থক্যের মূলে। বিরোধাভাস আর স্বপ্নময়তা যা ইন্দ্রিয়ানুগ ছাড়াও তাঁর কাব্যভাষায় ধুয়ো আর সাধুক্রিয়া সর্বনামের আধিক্য দেখা যায়। এটি খুব সম্ভব তাঁর গদ্যচালের পয়ারের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবু বলবো সাধুভাষার ব্যবহার অনেক সময় সংকেতময় হয়ে ওঠে যেখানে তিনি অতীতমুখী বোধে আর মধ্যযুগীয় ঐশ্বর্য বর্ণনায় আচ্ছন্ন হয়ে যান।

আমার কেমন যেন মনে হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায় চিন্তন ধীরে ধীরে চূড়ান্তচূড়ায় ওঠেনি অথবা বক্তব্য মধ্যপদলোপী কিংবা সে প্রতীক থেকে প্রতীকান্তরে গিয়ে সম্পূর্ণ হোলো; প্রায়ই তা আভাসিত, প্রতিভাত। সমগ্র কবিতার ভেতর তার একটা উদাসীন বিস্তৃতি। এই জন্যেই তাঁর কাব্যের মূল সুরটা হয়তো এতো আমাকে বাজে, তার যেন ছোঁয়া লাগে কিন্তু ধরা গেলো না। আসল কথা বুঝি দেখাই জীবনানন্দের চরিত্র, বলা নয়।

এবং এমনটা কেন হোলো বলতেই আমরা এসে পড়ি তাঁর কাব্যের পুরোনো কথাটিতে। এক ধরণের অবচেতনাময়তা তাঁর কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। বনলতা সেন-এ তিনি পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছেন প্রকৃতির অতল আর সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে।

গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার স্বাদ।

কুড়ি কুড়ি বছরের কুনকোয় সময় মাপা হোলো এবং সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু দাঁড়িয়ে আছে শ্রেয়তর বেলাভূমি। যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে সে অমৃতসূর্যকে দেখতে পেয়ে গেছে তারপর। "এক ধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব চেতনার জিনিষ" (শ্রেষ্ঠ কবিতা : ভূমিকা) তাঁর সৃষ্টির উপাদান হয়েছে। ঊর্ধ্বের আকর্ষণ বলতে কি বোঝা গেলো। অবস্থার ওপরে পৌছানোর ধারণা তা কোন কূটৈষাজাত কিনা এই প্রশ্ন হলে আমরা বলতে পারি জীবনানন্দের মৃত্যুবোধের উৎস কি নিরাশার, কোন তারুণ্যের পরাজয়ে নয়। এর পেছনে ইতিহাসবুদ্ধির সেই নির্মমতা অভিজ্ঞতার সেইসব উপাদান যেগুলি জড়ো হলে যাত্রায়

সন্দেহ আসে, মানবতার ক্লান্তির কান্নার নিদারুণ নৈঃশব্দ্যকে শোনা গেলো। বনলতা সেনের বিশেষত্ব এখানে কবিদৃষ্টি নির্জনতা খুঁজলো প্রকৃতিতে, কিন্তু তাঁর খুঁজে পাওয়া প্রকৃতিতেও অভিজ্ঞতা দেখেছে উদাস অনাত্মীয়তা। তার দয়া সহৃদয় হোলোনা, তার মধ্যে আছে কোনও অ-মানুষিকতা :

তার মুখ মনে পড়ে এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতংগের কাছে চলে এসে ; চারিদিকে রাত্রিনক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

তাই ইতস্তত যে দেবদারু ছায়ারা তারা দ্বারকার বিচূর্ণ থামের মতো, মৃত আর ম্লান সময়ের অবিশ্রান্ত আঘাতের কাঠিন্যে আর নিষ্ঠুরতায়।

আমি যদি বনহংস হতাম
বনহংসী হতে যদি তুমি
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধান ক্ষেতের কাছে।
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাসমাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।
আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেলো।
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
সেই স্পষ্ট নির্ল্লিতিতে—তাই-ই ঠিক।
এই নারী অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে।

উদ্ধৃতিগুলো ইংগিতময়, প্রকৃতির নিষ্কারুণ্য তার অন্ধ-আক্রোশী ইতিহাস হয়তো মানুষ বলেই কখনো কখনো কবিকে সংশয়ী করেছে। মানুষ, প্রকৃতি যতক্ষণ দুটি স্বতন্ত্র পরিচয় ততক্ষণই প্রকৃতি নির্মম, তাই কবি মাঝে মাঝে এবং বনলতা সেনের কবিতাবলীতে বহুলাংশেই তার সংগে আত্মলীনতা চেয়েছেন, প্রকৃতির চরিত্র জীবনের ধরণ আয়ত্ত করতে হবে। আবার মাঝে মাঝে ভেবেছেন আমাদের আশা আকাংক্ষা, জীবনানুসরণ আর যাত্রা যদি প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন হয় তাহলেই হয়তো নিষ্ঠুর যে অপ্রতিরোধ্য তাকে এড়ানো যাবে। সমাধান সেখানে আপাততৃপ্তি এনেছে। 'ঝরিছে মরিছে সব এইখানে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। তাই যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে ; নক্ষত্রের তীরে সেই প্রকৃতিপৃথিবীর ঊর্ধ্বলোকে প্রেমিক খুঁজে পাবে তার প্রেয়সীকে, নারী সংগীকে। কবির উৎকৃষ্ট চিত্ত (বাগর্থের দিক থেকে ঊর্ধ্বের আকর্ষণ যে চিত্তে) যদি এই সমাধান খোঁজে তাহলে নিশ্চয় তা নিরাশ্রয়ের। তবুও এ প্রবৃত্তিই একমাত্র নয় একথা স্মরণ রেখেও বলতে

হবে যুগান্তরের যন্ত্রণা, সাময়িকের বিভীষিকা, ভবিষ্যতের নৈরাশ্য আর সভ্যতার বিদ্রূপ কবিকে নিরাশ্রয়ী করেছে। একদিকে এই নগরজীবন অপর দিকে প্রকৃতিপৃথিবী। প্রথমটিকে তিনি ক্ষমা করেন নি। 'সাতটি তারার তিমিরে' তার অজস্র পরিচয়, পরবর্তী কবিতাবলীতেও, বনলতা সেনের সমস্যার আপাতসমাধান যদিও দ্বিতীয় দিকে, তবু এপথেও বিশ্বাস নিরন্তর সংশয়ী যা বিজ্ঞানবুদ্ধির দান। একটা কোন আশ্রয় নিশ্চিত হয়নি বলেই বনলতা সেন ও মাঝে মাঝে অন্য অগ্রন্থবদ্ধ কবিতা কিছুতে এক তৃতীয় নক্ষত্রলোক চেয়েছেন। তবু মৃত্যুই যদি কবির কাব্যভাবনাকে একটা নিশ্চিত ছেদে পৌঁছে দিলো, তাহলে দেখি 'আলোপৃথিবী' যা উত্তরমৃত্যুকালে ছাপা হয়েছে 'দেশে' তাতে পাওয়া যায় বনলতা সেনের বক্তব্যের আরও বিশ্বাসী এক কাব্যরূপ :

শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহলেও রবে ;—তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নবনব জলধারা উজ্জ্বল জগতে।

প্রাণের সেই অভিজ্ঞা, জীবনের অর্থান্বেষার সেই শতাব্দীপ্রাচীন সংকল্প আর ব্যাকুলতা এপথেই হয়তো আদি ব্যথার মুক্তিতে আশ্বস্ত হয়ে প্রকৃতিপৃথিবীর শান্ত আশ্রয়ে ; কিন্তু এবারে বুঝি সে আশ্রয় আরও কতো ঘরোয়া আর সংবেদনাময়, হৃদয়ের মর্মরিত হরিতে সে নবার্থে প্রোজ্জ্বল। প্রকৃতির কাছ থেকে তিনি যে ধরণের প্রাণবোধে সচেতন হয়েছেন তা স্তিমিত যেন মৃত্যুর অনিবার্যতায় জীবন ম্লান হয়ে গেছে। তবু 'আলোপৃথিবী'তে প্রকৃতি উদ্ভাসিত প্রাণের যৌবন আর আবেগে এবং সে-সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে মানুষ যদি 'হতে চায় অন্য কোন আলো কোন মর্মের সন্ধানী' তাহলেও সবগ্লানি না কাটলেও, আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে, একথা মানতেই হয় (এই কবিতাটির বেশী আলোচনা করে ফেলার দরুণ) যে হয়তো মৃত্যুর আকস্মিক ছেদ না এলে জীবনানন্দের প্রকৃতি চৈতন্য আরও প্রাগ্রসর হোতো, বক্তব্যের অন্য কোন হতাশ উত্তরণেও বটে।

এখন আমরা একটা জিজ্ঞাসায় পৌঁছতে পারি যে জীবনানন্দের কোনও নিশ্চিত জীবনদর্শন ছিলো কিনা। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ভিন্নমুখী মনোভাবগুলি আমরা দেখেছি। তবু বলা যায় সময়ের সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় একধরণের সমদৃষ্টি রয়ে গেছে বরাবর। এবং একথা অবশ্যমান্য জীবনানন্দের কাব্যপটভূমি এই কাল, কখনো যা সমগ্রতায় নির্মম আর উদাসীন আর কখনো সাময়িকতায় অস্থির। 'সময়' শব্দটির অবিশ্রান্ত আনাগোনা তাঁর আগাগোড়া কাব্যে লক্ষণীয় বটে এবং 'সাতটি তারার তিমির' এ বিষয়ে দৃষ্টান্তগ্রন্থের কাজ করতে পারে। প্রসংগত একটা কথা উল্লেখযোগ্য 'বনলতা সেনকে' নিয়ে আলোচনায় আমরা প্রায়ই 'সাতটি তারার তিমির'-এ এসে পড়েছি। কারণ, উভয় গ্রন্থের কালগত নৈকট্য বা

অভিন্নতা।" বনলতা সেনের সিগনেট সংস্করণের কবিতাবলীর লিখনসময় ১৩৩২ থেকে ১৩৪৬ যখন সাতটি তারার তিমিরের রচনাকাল ১৩৩৫ থেকে ১৩৫০। জীবনানন্দের কালচেতনা :

তবুও সময় স্থির নয়
আরেক গভীরতর শেষরূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়। (সুদর্শনা : বনলতা সেন)
হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো।

বা

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবেনা সময়
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী। (শ্যামলী)
পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়
হয় নাকি ? (দুজন)

বনলতা সেনের এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা পাচ্ছি সময় অস্থির আর অপার, খেলা করে মানুষের স্বপ্নমাটি আশা আকাংক্ষার বিলীয়মানতায়, তারই অমেয় জলে বারবার সময়ের শতকের মৃত্যু হয়ে তবু দাঁড়িয়ে থাকে আর এক শ্রেয়তর বেলাভূমি, আরও সময় আরও প্রাগ্রসর চৈতন্যময়তায়। 'সাতটি তারার তিমিরে'ও এই চেতনা। পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে যায়, কিন্তু যদি বলা যেতো কেটে গেছে। পুনরুদয়ের ভোর আসে, কারণ সময় যে অপার। সে অনেক বিচিত্ররাত শেষ করে, তবু মানুষের আর ঘুমোবার হৃদয় নেই। বনলতা সেনের মুখোমুখি হতে গিয়ে তিনি জেনেছেন পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন। এখানেও দেখি 'কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ।'

বনলতা সেনের কবিতাগুলিকে একটা মোটামুটি ভাগ করা যায় কিনা দেখতে গেলে দেখা যায় চরিত্রের দিক থেকে দারুণ পার্থক্য কিছু নেই, তবু আছে আর আছে গঠনে এবং সুরে।

এক ॥ ঘাস, হায় চিল, বুনো হাঁস, হরিণেরা, তুমি, ধান কাটা হয়ে গেছে, শিরীষের ডালপালা। হ্রস্বগঠন এইসব কবিতাগুলির মৌল রসকেন্দ্র প্রকৃতি। হায় চিল সম্পূর্ণ গাথা-গীতি। অন্যগুলিতে প্রকৃতির দৃশ্যচিত্রের আড়াল থেকে একটা সিদ্ধান্ত উঠে এসেছে।

দুই ॥ অন্ধকার, কমলালেবু, হাওয়ার রাত, শিকার, আমি যদি হতাম অঘ্রাণ প্রান্তরে, কুড়ি বছর পরে পথ হাঁটা, আমাকে তুমি, বেড়াল, দুজন, নগ্ননির্জন হাত। কবিতাগুলি মূলত বক্তব্যধর্মী এবং বর্ণনামূলক। বর্ণনার মধ্যেও বক্তব্যের আয়োজন ঘটে গেছে। এই ভাগের রচনাগুলিতে হ্রস্বদৈর্ঘের পার্থক্য কবিতা থেকে কবিতান্তরে বেশ বড়। অধিকাংশই সম্পূর্ণ গদ্যে আর কিছু যা সমিল তাও প্রায় গদ্য পয়ারের চালে। এইসব কবিতার পটভূমি

প্রকৃতি, তবে প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বক্তব্য এখানে নেই ততটা, যতটা আছে মানুষ প্রেম প্রভৃতির। প্রকৃতির বিশিষ্ট কিছু দৃশ্য গন্ধ অন্ধকার আর তার ক্ষমাহীন অনিবার্যতা শুধু কথা বলবার প্রধান সহায়।

তিন॥ বনলতা সেন, সুদর্শনা শ্যামলী, সুচেতনা, সুরঞ্জনা, শঙ্খমালা, মিতভাষণ ইত্যাদি কবিতাগুলি কথা আর কবিতা আশ্চর্যভাবে সুসমঞ্জস। এগুলি এদিক থেকে আমাদের সাহিত্যের বিশিষ্ট অর্জন। শুধুই নারীচিত্র এইসব কবিতার মূলে বলে মনে করতে আমার বাধে। অবশ্য এর মধ্যে দুএকটি কবিতায় সমস্যাটি ততো স্পষ্ট নয় যা অন্যগুলিতে। সুচেতনা কি শুধুই এক নামমাত্র না আরও মহত্তর অর্থে ইংগিতময়! সু-চৈতন্য ওখানে সম্বোধিত মনে করলে অর্থগ্রহণে আমার কাছে যথেষ্ট স্বচ্ছতা আসে। মানুষের সামরিক হৃদয় থেকে সুস্থচৈতন্য বুঝি অবসিত, সে যেন নক্ষত্রলোকের দূরত্বে নির্জন এক দ্বীপ, সুরঞ্জনাও যেন সানুরাগ বা প্রেমের প্রতীক। আমাদের পৃথিবীতে সে এক আদি অভিজ্ঞানের মতো। এই আংগিকের অর্থবোধে আমিও সবকটি কবিতার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারিনি। তবু এই ধারণা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। নামগুলির অপ্রচলন প্রথমত আর দ্বিতীয়ত শুধুই নারীপ্রেম এর উপজীব্য মনে করলে অর্থগ্রহণের প্রায় অসুবিধাই এদিকে আমাকে টানে। বনলতা সেনে কবির দৃষ্টি প্রকৃতিকেন্দ্রিক যেমন 'সাতটি তারার তিমিরে' তিনি মানবসমাজ সম্বন্ধে যত ভিন্ন এবং হতাশ ভাবেই হোক অবহিত। বনলতা সেন নামটিও ব্যঞ্জনাময়। এর মধ্যে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত নারীমুখে। তাই তার নাম হোল বন-লতা। যে চৈতন্যজর্জর প্রাণ আশ্রয় খুঁজছে তাকে আশ্রয় দিতে পারে শান্তি দিতে পারে দুদণ্ডের শুধু বনলতা সেন তথা প্রকৃতি। যে ইতিহাস মৃত তাকি স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকৃতির অংগ নয়, অর্থাৎ ইতিহাসের সেই সব ভগ্ন তোরণ প্রাসাদ প্রাচীর। এই প্রকৃতি সেই অতীত ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়ের অন্ধকার আর তার দুর্লভ শিল্পের সৌন্দর্যের লীনতায় আর ঐতিহ্যে গভীরসুন্দর। বনলতা সেনের চুলে তাই অন্ধকার বিদিশারাত্রির গাম্ভীর্য, মুখে শ্রাবস্তীনগরীর গভীর সৌন্দর্য। শ্যামলীকে তাই যৌবনের প্রতীক মনে হয়। এই যৌবন প্রাচীন, প্রেমেরই মতো পৃথিবীর বয়সিনী। পুরোনো শতাব্দীর সঞ্চিত শক্তি তাকে ঘিরে। কতবার এই শ্যামল প্রেরণায় তারা ললিতস্বাচ্ছন্দ্যের আশ্রয় ছেড়ে সংগ্রামে ডুবে গেছে। কি সুরঞ্জনা বা শ্যামলী সবাই-ই তাই মেয়ের মতন, মেয়ে নয়, আমার যেন মনে হয় আমাদের আদিম মূল্য বোধগুলি কবিতায় এসেছে নারীরূপে, কারণ বুঝি তারা নারীরই মতন কাম্য, অনিবার্য আকর্ষণ, আমাদের অবচেতনার আড়ালে তাদের প্রেয়সীর আসন নিশ্চিত।

বৃহত্তর প্রতিভারা আছেন আমার এ ধরণের গ্রহণের যৌক্তিকতা বিচারে। ব্যাখ্যা নয়, আমি শুধু সংকেত দিলাম। এমন একটি অর্থ আমাকে গ্রহণ করেছে। আমার এ আলোচনা নেহাৎই পাঠকের পর্যায় থেকে। জীবনানন্দের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি তাঁর ভাষা শব্দ চিত্র বহিরংগমাত্র। অন্তরংগেই তিনি সত্যকারের জটিল। তাঁর চিন্তনদর্শনের

অনিবার্য কুয়াশায়। ইতিহাস, সময়, প্রকৃতি তিনটিই নাগালের বাইরে মানুষের, কিছুটা বা সম্পূর্ণ। এইগুলিই যাঁর কাব্য উপাদান তাঁর প্রকাশভংগি আশ্চর্যসরল হয়েও যথার্থ দুরূহ হবেই। ব্যক্তিগত ধারণার ধ্যানী বুনোনিকে যিনি ছুঁয়ে তন্ময়তায় মগ্নসর্বস্ব তিনিতো আর্ষ নির্জনতার অধিবাসী। তবু হাজার বিদেশী শৈলী আর চিন্তনের তীক্ষ্ণ দার্শনিক নিবিড়তা পেরিয়েও তিনি মায়াবীস্বরেলা, এমন কি ইদানীং তিনি সম্পূর্ণ দর্শনলোকের বাসিন্দা হয়েও তাঁর কাব্যভাষার প্রসাদে মনোহারী ছিলেন। জনপ্রিয় তিনি হতে পারেন না, তবু প্রিয় যে তিনি তা বহুলত এই কারণেই।

বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ

দিলীপকুমার ভদ্র—পঞ্চম বর্ষ, বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা মানুষের অত্যন্ত আদিম ও চিরন্তন প্রবৃত্তি। এই অনুসন্ধিৎসার ফলেই মানুষ আজ তার চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নানারকম জ্ঞানের অধিকারী। বিশ্বের রূপকল্পনাও এই জ্ঞানলাভের দরুণই সঞ্জাত। এই বস্তুরূপ ও বৈজ্ঞানিক পরিচিতির মূল ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। বস্তুজগৎ থেকে প্রাপ্ত এই জ্ঞানের সাহায্যে বস্তুধর্মের এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির একটা নিয়মানুগ কাঠামো তৈরী করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিমূলক; বহিঃপ্রকৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, যেগুলিকে আমরা ঘটনা বা phenomena বলতে পারি, তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করা এবং সেই-সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর তাদের বহিঃপ্রকাশের রূপপরিবর্তন অনুধাবন করাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগসূত্র বা সহজ কথায়, তাদের একটা আকৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে উপলব্ধিমূলক। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃস্থ বিশ্বের যোগাযোগ ঘটছে এই উপলব্ধির ভিতর দিয়েই। মানুষের আদিম অনুসন্ধিৎসা, যা যুগে যুগে নূতন নূতন জ্ঞানোন্মেষের সহায়তা করছে, তাও নব নব রূপে জেগে উঠে এই উপলব্ধিরই বিভিন্ন ধারার ভিতর দিয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক দর্শনের কার্যক্রম মোটামুটিভাবে দু'টি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) অনুভূতি স্তর, ও (২) উপলব্ধিস্তর। এই দু'টি স্তরের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি সম্পূর্ণ যুক্তিবাদের উপর নির্ভরশীল। আর একটি জিনিষ, যা এই উপলব্ধিস্তরের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, সেটা হচ্ছে চিহ্নাঙ্কন বা Symbolism। যখন আমরা কোনও পরীক্ষা বা পরিমাপ করছি, তখন সত্যি আমরা কি করছি তার উপলব্ধি বা জ্ঞানকে সাধারণতঃ

আমরা গাণিতিক চিহ্নের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অনুভূতিস্তরে যা ঘটছে উপলব্ধিস্তরে তার ছাপ বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। এর একটি অতি আধুনিক উদাহরণ হচ্ছে Symbolic Algebra যা এডিংটন ব্যবহার করেছেন।

উপরে এতগুলি কথা বলবার দরকার হচ্ছে এই জন্য যে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বৈজ্ঞানিক পরিচয় ঘটছে কতকগুলি বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে। এটাও খুব পরিষ্কার যে, বৈজ্ঞানিক কাঠামো যেটা গড়ে তোলা হচ্ছে, সে এই উপলব্ধি স্তরেই ঘটছে। সুতরাং, এই স্তরের ছাপ বা চিহ্নাঙ্কনকে নির্জলা বাস্তব অনুভূতির দ্বারা বিশ্লেষণ করতে গেলে নানারকম গোলমাল ও ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার উপস্থিত হতে বাধ্য। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজ্ঞান ও বহির্বিশ্বের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে যোগাযোগ ঘটছে—

প্রাকৃতিক ঘটনা —> অনুভূতি স্তর —> উপলব্ধিস্তর —> গাণিতিক বিশ্লেষণ
[বৈজ্ঞানিক সত্য]

সুতরাং, বিজ্ঞানকে যদি আমরা প্রাকৃতিক দর্শন বলি, তাহ'লে কোনও ভুল বলা হয় না। অনুভূতি স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা উপলব্ধি স্তরে যে সব সত্য খাড়া করি সেগুলির সবগুলিই বৈজ্ঞানিক সত্য কিনা এবং তাদের ভিতর মানুষের সহজাত বুদ্ধি ও অনুভূতি কতখানি কার্যকরী তা বিচার করে দেখবার পূর্বে, বিজ্ঞান কিভাবে আজ পর্যন্ত প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছে, তা মোটামুটিভাবে একবার দেখা যাক।

ক্লাসিকাল যুগে প্রকৃতিকে অত্যন্ত সুসমঞ্জস ভাবা হ'ত এবং সেখানে কোন কিছুই যে খামখেয়ালীভাবে চলছে না, তাও ধরে নেওয়া হ'ত। তখন কার্যকারণবাদের সর্বময় আধিপত্য ছিল। তখনকার দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞান কতকগুলি অতি সাধারণ অনুমানের উপর গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কার্যকারণবাদ। কার্য এবং কারণের ভিতর দিয়েই কোনও অনুমানগত মতবাদ একটি প্রাকৃতিক নিয়মে পর্যবসিত হ'ত। গতিবিদ্যার সুদৃঢ় নিয়মগুলিই ছিল তখন প্রকৃতিকে বোঝবার একমাত্র উপায়। কোনও বস্তুর বর্ত্তমান গতি ও অবস্থা জানা থাকলে, পরে যে কোনও সময়ে তার কি অবস্থা হ'বে, তা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হ'ত। অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন ইত্যাদি কণিকা তখন বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল, বস্তুর বৃহত্তর সত্তার সঙ্গেই তাদের পরিচিতি সীমাবদ্ধ ছিল। মোটামুটিভাবে তখনকার বিজ্ঞান প্রকৃতিকে অনুভূতি ও অনুভূতিমূলক তুলনার সাহায্যে চিত্রিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। কিন্তু ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি বস্তুকণিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এবং বস্তুর ক্ষুদ্রতম সত্তার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্রমশঃই পরিষ্কার হ'তে লাগ্‌ল যে, বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে জানা অসম্ভব। বর্ত্তমান অবস্থাই যদি সুনির্দিষ্টভাবে জানা না থাকে তবে ভবিষ্যতের অবস্থাও সুনির্দিষ্টভাবে জানার কোনও প্রশ্নই উঠে না। তাহলে দেখা

যাচ্ছে যে, ক্ল্যাসিকাল কার্যকারণবাদের ঋজুতা এখানে কিছুটা ঢিলে হয়ে পড়ছে। আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়াণ্টাম্ পরিমিতিবাদ ও অনির্দেশ্যবাদ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল কার্যকারণবাদের সার্বজনীনতা ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের রূপ তখন বদলে গেল। সম্পূর্ণ অনুভূতিগত পরিচয় তখন আর সম্ভব হ'ল না।

অনুভূতিগত পরিচয় যে কখনও পরিপূর্ণ (complete) হতে পারে না, তা একটা উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা হাক, ত্বরণশীল (accelerating) একটি ইলেকট্রনকে আমরা পরীক্ষা করছি। এখানে পরিমাপ আমরা যেটা করছি, তা ঠিক ঐ ইলেকট্রনটিকে নিয়ে নয়, সেটা তার গতির জন্য নির্গত বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরংগকে নিয়ে; এবং এ থেকে আমরা ইলেকট্রনটির গতি ও শক্তি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি। তাহ'লে, এখানে প্রকৃত ইলেকট্রনটি কিন্তু অনির্ণেয়ই থাকছে। ব্যাপারটা এখানে মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে এই রকম—এক্ষেত্রে, অনুভূতিস্তরে আছে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরংগের উপর কতকগুলি পরিমাপ ও পরীক্ষা। উপলব্ধিস্তরে আছে, এই পরিমাপ ও পরীক্ষা দ্বারা কি করা হচ্ছে, তা বোঝবার চেষ্টা ও তার গাণিতিক বিশ্লেষণ। এই উপলব্ধির সময়ই আমরা বলছি যে, এই সকল তরংগের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যদি একটি ঋণাত্মক বিদ্যুদাহিত কণিকার (অর্থাৎ, ইলেকট্রনের) অস্তিত্বের কথা আমরা মেনে নি, এবং এটা বলার পরই আমরা তার গতি-শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে পারি, তার আগে নয়; বস্তুর অস্তিত্ব কিন্তু এখানে আপনাআপনিই ধরে নেওয়া হচ্ছে। ঠিক এমনিভাবেই বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে আমরা প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন (ধনাত্মক ইলেকট্রন), মেসন, ইত্যাদি আদিম বস্তুকণিকার অস্তিত্বের কথা ধরে নি। তাহ'লে বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিমূলক নয়। বস্তুর নির্দিষ্ট কতকগুলি ধর্ম আছে এবং তা জানবার জন্য আমরা যে সব পরিমাপ বা পরীক্ষা করে থাকি, এই দুটোকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়েই বস্তুর বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব। সুতরাং পরীক্ষা বা পরিমাপের সময় যে সকল অনির্দেশ্যতা অবশ্যম্ভাবীরূপে চলে আসবে তা বস্তুর অবস্থানকেও অনির্ণেয় করে তুলতে বাধ্য। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হ'বে, এই অনির্ণেয়তা থেকে যদি আমরা ধরে নি যে, বিজ্ঞানী বস্তুজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনা বা কোনও কিছুরই নির্দ্দেশ করতে পারেন না বা সে সম্বন্ধে অবহিত পারেন না, তা হ'লে ভয়ানক ভুল করা হ'বে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তুর সম্পর্কে সর্বদাই অবহিত, তবে সে সম্বন্ধে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা তার পক্ষে অসম্ভব, তিনি কেবলমাত্র তার কতখানি সম্ভাব্যতা আছে, সেটুকুই বলতে পারেন।

এবার আমরা প্রকৃতির বস্তুরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। স্বভাবতঃই এমন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বস্তু যখন সম্পূর্ণরূপে নির্ণেয় হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে তার রূপকল্পনা কি করে সম্ভব। এর উত্তরে প্রথমেই একটা কথা মনে রাখতে হ'বে যে, বস্তুর রূপকল্পনা

একটা সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিগত তুলনা মাত্র। পরমাণুর উপর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড মনে করতেন যে পরমাণুর অভ্যন্তরে কতকগুলি ইলেকট্রন বিভিন্ন বৃত্তাকার পথে কেন্দ্রের চারধারে ঘুরছে। এখানে পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের যে উপলব্ধি হয়েছে তার একটা অনুভূতিমূলক পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। এ রকম একটা পরিচয় না দিলেও তেমন খুব একটা গুরুতর ক্ষতি হ'ত না। আধুনিক তরংগ বলবিদ্যার (Wave Machines) আলোকে দেখতে গেলে এই একই জিনিস আবার একটু অন্যরকম দাঁড়ায়। এখানে ইলেকট্রন সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ণেয় হচ্ছে না এবং সেক্ষেত্রে বর্তুলাকার পথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কল্পনা অসম্ভব। সেখানে ইলেকট্রনটিকে একটি তড়িদাহিত মেঘের মত কল্পনা করা হয়; অর্থাৎ তখন ইলেকট্রনটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে না থেকে একটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। যেহেতু ইলেকট্রনটিকে পরীক্ষার সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে আছে কিনা জানা সম্ভব নয়, সে জন্যই এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, যে অনুভূতি স্তরে একটা নির্দিষ্ট অনুভূতি হয়েছে বটে, কিন্তু উপলব্ধি স্তরে তার রূপায়ণ বিভিন্ন হ'তে পারে, তা'তে কোনও কিছু যায় আসে না। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে সংলগ্নতা রাখতে গেলে উপলব্ধিস্তরের এরকম পরিবর্তন হ'য়ে থাকে, কারণ বিজ্ঞানের যে আকৃতি গড়া হচ্ছে, এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতির যে রূপারোপ আমরা করছি, তা এই উপলব্ধিস্তরেই গড়ে উঠছে। এ রকম একটা আকৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারটাকে যদি আমরা কেবলই বাস্তবতার ভিত্তিতে যাচাই করবার চেষ্টা করি তাহ'লে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যাচ্ছে যে সেক্ষেত্রে ভীষণ ভুল করা হ'বে। উপলব্ধিকে এই যে স্তরীভূত করে তোলা হচ্ছে তা অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে একেবারে অন্যায় করা হ'বে; এটাকে দেখতে হ'বে তার সম্পূর্ণ নিজের দিক থেকে, একটা নূতন ধরণের অভিজ্ঞতা নিয়ে, দেখতে হ'বে তার ভিতরকার সুসমঞ্জস রূপ, তাহলেই তখন তা বাস্তব বলে বোধ হবে। বাস্তবতা আপেক্ষিক এবং সেই জন্য বিজ্ঞানের এই যুক্তিসমৃদ্ধ রূপ, যা অনুভূতিকে নিয়ে অথচ অনুভূতিকে ছাড়িয়ে গড়ে উঠেছে, তাকে প্রকৃতির আসল রূপ বলে মেনে নিতে আমাদের কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। সত্য যে একটা আছে এবং তার খোঁজ করাই যে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা, সেটাও সবসময় মনে রাখতে হ'বে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা সত্য যা মানুষের কতকগুলি অতি প্রাথমিক সহজাত বুদ্ধি ও অনুভূতির উপর নির্ভরশীল (এবং যে সব অনুভূতি সব সময় যুক্তিসহ না হ'লেও উপেক্ষা করা যায় না) এবং যা দিয়ে প্রকৃতির বৈজ্ঞানিকরূপ গড়ে তোলা হচ্ছে, তা কতখানি মৌলিক বা চিরন্তন হ'বে তা যাচাই করতে হবে, সেই জ্ঞান কতটুকু সংলগ্ন (Coherent) বা বিভিন্নমুখী প্রাকৃতিক জগতে তা কতখানি প্রযোজ্য তার দ্বারা। এইভাবে বিচার করে নিলেই প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক রূপের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে আমাদের নীতিগত কোনও বাধা থাকা উচিত নয়।

প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক রূপ সম্বন্ধে এবার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এই সব

উদাহরণের ভেতর দিয়ে আমরা প্রধানতঃ বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধের ব্যাপারে আগে যা বলা হয়েছে তাই পরিষ্কার করে দেখবার চেষ্টা করব।

আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে বিশ্বকে একটা চতুর্মাত্রিক জগৎ হিসেবে ধরা হয় এবং বস্তুকে দেশ-কাল-সন্ততির (Space-time-continuum) ভেতর আবদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। এর আগে বিশ্বকে ত্রিমাত্রিক বলে ধরে নেওয়া হ'ত। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রের সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে এবং কতকগুলি পরীক্ষামূলক সত্যের ব্যাখ্যা করবার জন্য, আইনষ্টাইন গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখলেন যে, বিশ্ব চতুর্মাত্রিক হ'লে এ সব ব্যাখ্যা সম্ভবপর এবং তিনি সময়কে বিশ্বের চতুর্থমাত্রা হিসেবে নির্দেশ করলেন। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে যে বিশ্বকে আমরা বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপলব্ধি করছি, অর্থাৎ উপলব্ধিস্তরে বিশ্বের যে রূপ গড়ে তোলা হচ্ছে, তা চতুর্মাত্রিক। এটা যদি পঞ্চমাত্রিকও হ'ত, তাহলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। (প্রকৃতপক্ষে, ক্লাইন ও কালুজা নামক দুইজন বিজ্ঞানী একটি পঞ্চমাত্রিক বিশ্বের গাণিতিক পরিকল্পনাও করেছিলেন।) কেবলমাত্র এ রকমই একটা চতুর্মাত্রিক বিশ্বে বস্তু অবস্থান করলে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলী সুসমঞ্জস-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলীও এ রকম একটা বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আইনষ্টাইন আরও বললেন যে কোনও বস্তুর অবস্থান এ রকম একটা বিশ্বে একটি মহাজাগতিক রেখা বা দেশ-কাল রেখা (World Line) দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে। চতুর্মাত্রিক বিশ্বে অবস্থিত বস্তুনিচয়ের গুণাবলীও এই রেখার দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয়।

হাব্‌বল ও আরও কয়েকজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বের দূরবর্ত্তী নীহারিকাসমূহ হ'তে আগত আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে একটু অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের মতে নীহারিকাসমূহ ক্রমশঃ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার গতিবেগ, যে নীহারিকা যত দূরে, তার তত বেশী। এ থেকে ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্বের একটি পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা গড়ে তোলেন। বিজ্ঞানীদের মতে, আইনষ্টাইনের পরিকল্পিত চতুর্মাত্রিক বিশ্বে বস্তুর অবস্থিতির দরুণ এ রকম একটা ব্যাপারের উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সম্বন্ধে অবশ্য নানারকম মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে অধুনা প্রচলিত প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বণ্ডির স্থিতিবান বিশ্বের (Steady-state Universe) পরিকল্পনাটিতে কিছুটা নূতনত্ব আছে। আমরা জানি, যে নীহারিকা যতদূরে, তার অপসৃত হবার গতিবেগও তত বেশী। সুতরাং, দূরবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা চালাতে আমরা এমন কতকগুলি বহুদূরবর্ত্তী নীহারিকা দেখতে পাব যাদের দূরে সরে যাওয়ার গতিবেগ আলোর গতিবেগের প্রায় সমান হয়ে গেছে। এই ক্রমবর্ধমান গতিবেগ যখন ঠিক আলোর গতিবেগের সমান হবে তখন সেখান থেকে কোনও আলোক এসে আর পৃথিবীতে পৌঁছবে না। তখন ঠিক যেন আমরা বিশ্বের একটি দিগন্তসীমায় পৌঁছে গেছি বলে মনে হ'বে। এই সীমানার অপরদিককার নীহারিকাসমূহ

আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। বণ্ডির মতে, এই দিগন্ত সীমাতে বস্তু আপনাআপনিই তৈরী হচ্ছে। কিছুদিন আগে যেখানে কোন বস্তু দেখা যাচ্ছিল না, সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ক্রমশঃ বস্তু দেখা দেবে। মহাশূন্য থেকে বস্তুর এই স্বতঃস্ফূরিত জন্মের হার এত কম (বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় একটি হাইড্রোজেন অণু মহাশূন্যের এক লিটর জায়গায় এক বিলিয়ন বছরে তৈরী হচ্ছে) যে তা কোনও পরীক্ষা দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু এর ফলে ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্বে বস্তুর ঘনত্ব নিয়ত একরকমই থেকে যাচ্ছে। বণ্ডির পরিকল্পিত এই বিশ্বের বিস্তৃতি অসীম এবং এর সময়ধারাও অনন্ত। বস্তুর নিরন্তর উদ্ভবের দরুণ অবশ্য এই জগৎ সর্ব্বদা এক স্থিতিবান অবস্থায় আছে।

মহাশূন্য থেকে বস্তু কেন এবং কি ভাবে আপনাআপনি তৈরী হচ্ছে, এ প্রশ্ন অনেকেই ন্যায়সংগতভাবে করতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, তার কোনও উত্তর নেই।

"কেন হ'বে"—এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের দেবার কথা নয়। বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষণ কেন থাকবে, সে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের কাছে চাওয়া অন্যায়। যদি মহাকর্ষণ থাকে তবে কি কি ঘট্‌বে বা সম্ভাব্য কি কি হ'তে পারে, সেটাই বিজ্ঞান কতকগুলি অনুভূতি ও কতকগুলি প্রাথমিক অনুমানের উপর নির্ভর করে বল্‌তে পারে, এবং তা থেকে উপলব্ধি স্তরটা কিভাবে গড়ে উঠ্‌বে তাও বল্‌তে পারে। এক্ষেত্রে, যেখানে আগে কোনও কিছু ছিল না, সেখানে পরে যদি বস্তু দেখা গিয়ে থাকে, তাহ'লে সেটা কোথা থেকে এসেছে, সেই প্রশ্নটা পুরোপুরি অর্থহীন নয় কি? যদি বস্তু জন্মাবার পূর্বে সেখানে অন্য কিছু থাকত তাহলেই না প্রশ্নটা অত্যন্ত ন্যায়সংগত হ'ত। তবে, শুধু আমরা একটি কথাই বল্‌তে পারি যে, বিশ্ব সম্বন্ধে পরীক্ষাগত যে সকল অনুভূতি আমাদের হয়েছে (যেমন, সেটা ক্রমবর্ধমান, তাতে বস্তুর একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব আছে, ইত্যাদি), তা থেকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যে বিশ্বকে আমরা উপলব্ধি কর্‌ছি তাতে মহাশূন্য থেকে বস্তুর নিয়ত সৃষ্টি একটি অঙ্গ মাত্র, যার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মের সুসামঞ্জস্য রক্ষিত হবে এবং অন্যান্য পরীক্ষামূলক সত্যেরও ব্যাখ্যা করা যাবে। এখানে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত আকৃতি যে একটা সুসমঞ্জস ঐক্য মেনে চলে, তা বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের অতি আদিম অনুভূতি ও উপলব্ধির অন্তর্গত।

আমরা আগেই বলছি যে, মহাবিশ্বে যে কোনও বস্তুর (ধরা যাক, একটি ইলেকট্রনের) অবস্থান একটি মহাজাগতিক রেখা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডিরাকের মতবাদ অনুসারে, মহাশূন্যের সকল স্থানে অগুণ্‌তি ইলেকট্রন নেগেটিভ্‌ শক্তিসমন্বিত অবস্থায় আছে; এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র পজিটিভ্‌ শক্তি, কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায়, প্রয়োগ কর্‌তে পারলে ইলেকট্রন সাধারণ স্তরে এসে যায় এবং তখন তার অস্তিত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা যায়। নেগেটিভ্‌ শক্তিসমন্বিত অবস্থা থেকে উন্নীত

হওয়ার ফলে মহাশূন্যে যে ফাঁক থেকে যাবে, সেটা সর্বদাই ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা কর্‌বে। স্বভাবতঃই, এই ফাঁকটির অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক যে সব ধর্মের দ্বারা নির্নীত হবে, সেগুলি ইলেকট্রনের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত হ'বে। এইসব ফাঁকগুলির নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। এদের ভর ইলেকট্রনের সমান কিন্তু গুণাগুণ (যেমন, বিদ্যুতাধান, ইত্যাদি) ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। এ দু'টি কণিকার ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার দরুণ তাদের মহাজাগতিক রেখাও দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক নির্দেশ কর্‌বে। এ থেকে মনে হ'তে পারে যে, পজিট্রনের বেলায় সময় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে; সুতরাং আমরা একটা নেগেটিভ্ সময়ধারার কথাও ভাব্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু সম্পূর্ণ অনুভূতির দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, এ রকম ধারণা করা অসম্ভব। তাহ'লে, এখানে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে একবার দেখা যাক। প্রকৃতপক্ষে, অনুভূতি স্তরে, ইলেকট্রন ও পজিট্রন উভয়েরই ক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তন একই দিকে হচ্ছে, কিন্তু উপলব্ধি স্তরে সময়ের পরিবর্তন পজিট্রনের বেলায় ইলেকট্রনের সময়ের পরিবর্তনের বিপরীত দিকে ঘটছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এর ফলে, ইলেকট্রন ও পজিট্রনের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির বৈপরীত্য ঘটছে এবং চতুর্মাত্রিক বিশ্বে তাদের দু'টি বিপরীতমুখী মহাজাগতিক রেখা দ্বারা নির্দেশ করা যাচ্ছে। এ পর্যন্তই বিজ্ঞান বলতে পারে, এর বেশী কিছু বলা তার পক্ষে অসম্ভব।

এরকম অনেক উদাহরণ আছে যেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ কোথায়, এবং কিভাবে বিজ্ঞান প্রকৃতির বাস্তব রূপ গড়ে তুলছে, তা পরিষ্কারভাবে বোঝান যায়। অনেকে এ রকম একটা প্রশ্ন তুলে থাকেন যে, উপলব্ধিস্তরে প্রকৃতির নানারকম রূপ গড়ে তোলা হচ্ছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে "আসল" রূপ কোনটা। প্রকৃতপক্ষে, এ রকম একটা প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। আসল কিংবা নকল বিচার করা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যে দু'টোর সঙ্গেই পরিচিত আছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় কতকগুলি অনুভূতি ও অনুভূতি-সমষ্টির ভেতর দিয়ে। অনুভূতি বস্তু নয়, তা কেবলমাত্র বস্তুর অস্তিত্বজনিত কতকগুলি অভিব্যক্তি যা আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। তাই এক্ষেত্রে বস্তুর "আসল" রূপটা সম্পূর্ণরূপে কল্পনার বাইরে। তবে এ কথাটা বলা যেতে পারে, যে, উপলব্ধিস্তরে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপায়নগুলির মধ্যে সেইটাকেই অধিকতর নিখুঁত বলে ধরে নেওয়া হবে, যেটা বিভিন্নমুখী বৈজ্ঞানিক জগতে অধিকতর সুচারুরূপে প্রযোজ্য, যার মধ্যে যুক্তিসম্মত সংলগ্নতা আছে বেশী এবং সর্বশেষে যেটা মানুষের প্রাথমিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর বেশী নির্ভরশীল।

এই সঙ্গে আর একটা কথাবলেই এই প্রবন্ধের শেষ করব। সেটা এই যে, কার্য থাক্‌লেই কারণ থাকবে, তা কেবলমাত্র তখনই কল্পনা করা সম্ভব যখন বস্তুর অস্তিত্ব বহিঃস্থ কোনও কিছুর দ্বারা আলোড়িত হচ্ছে না, কেননা বহিঃস্থ আলোড়নের দরুণ তার ভবিষ্যৎ অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে, তাই তখন আর সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বলাও আর সম্ভব হচ্ছে না। আর একথাটাও মনে রাখা দরকার যে, বস্তুর বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব কেবলমাত্র তার

নিরঙ্কুশ অস্তিত্বকে নিয়ে কখনও হ'তে পারে না, সেটা হবে, তার বিভিন্ন ধর্ম জানবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটিকেও নিয়ে।

সুতরাং, আধুনিক বিজ্ঞানের এই অনির্দেশ্যতার আলোকে কার্যকারণবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণার পরিবর্তন করতে হবে, তা হ'লে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ঐক্যও বিনষ্ট হবে না, বিজ্ঞানের সংলগ্নতাও বেড়ে যাবে।

কাব্য ও দর্শনের উপযোগিতা

অধ্যাপক **শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী**

যদি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের কার্যকারিতা দ্বারাই কাব্য ও দর্শনের মূল্য-বিচার করতে হয়—তাহলে বলতে হবে এরা মূল্যহীন। এরা ব্যবহারিক জগতে অব্যবহার্য—প্রত্যহের জীবন-যাত্রায় কোনো উপকারে লাগে না। একথা স্বীকারকরাই এই দুইটি মানস-ব্যাপার সম্বন্ধে যথার্থ সুবিচারকরা ও এদের মর্যাদা রক্ষা করা। বস্তুর মূল্যকে তার উপযোগিতার সম-ব্যাপক মনে করা আমাদের মূল্য-জ্ঞানের সংকীর্ণতারই নিদর্শন। জীবনের সুখ-সুবিধার উর্ধে কোনো জগতের অবস্থিতি আমাদের কাছে আকাশ-কুসুমের মতোই নিরর্থক মনে হয়। তাই যে বস্তু বা ব্যাপার প্রত্যক্ষ জীবন-লোকের সম্বন্ধচ্যুত তাকে আমরা অলীক এবং মূল্যহীন বলে সরিয়ে রাখি—যেমন রাখি আমাদের স্বপ্নকে ও আমাদের ভ্রম-ভ্রান্তিগুলিকে। কাব্য ও দর্শনকে আমরা কার্যতঃ কতকটা এমনি ভাবেই সরিয়ে রাখি। এদের চিত্ত-বিলাস বলে কিছুটা মূল্য দিই কারণ বিলাসেরও উপযোগিতা আছে। কিন্তু কেমন একটু সন্দেহ বা সংকোচ-বশতঃ আমরা অনেকে এদের বিলাস-মাত্র ভাবতে পারিনে। ইচ্ছা হয় এদের কিছু মূল্য দিতে এবং সে-জন্যই খুঁজি এদের মধ্যে এমন কোন-কিছু—যার উপযোগিতা বাস্তব-জীবনেও আছে। কারণ মূল্যের সংজ্ঞা আমাদের তাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে আমরা এই দুইটি মানস-ব্যাপারের প্রকৃতির একটি বিকৃত রূপ কল্পনা করে থাকি এবং এদের মধ্যে এমন সব বস্তু আবিষ্কার করি যা-এদের মধ্যে নেই। অর্থাৎ এ-আবিষ্কার আমাদের উদ্ভাবনা মাত্র। এই সব অনর্থের মূলে আছে আমাদের সংস্কার—যে, আমাদের জীবন-ধারণ ও উন্নতি-সাধনই আমাদের পরম শ্রেয় ও প্রেয় এবং সকল মূল্যের মাপকাঠি। অথচ এর সঙ্গেই রয়েছে আর একটি সহজাত ধারণা যে আমাদের কাব্য ও দর্শন আমাদের নিছক চিত্তবৃত্তির বিলাস নয়—বরং কোন সত্য-লোকেরই প্রতিফলন। যেহেতু এই সত্য-লোকের ধারণা আমাদের মধ্যে খুবই অস্পষ্ট অথচ এরই প্রভাবে আমাদের কাব্য ও দর্শনকে ঠিক স্বপ্ন বা ভ্রান্তির মতো অলীক ও মূল্যহীন বলতে মন সরে না। সেইজন্য আমরা এই দুটি মানস-ব্যাপারকে

জীবনের অন্যান্য কার্যোপযোগী বস্তুর মতোই দেখতে উদ্যত হই। সেই অতিব্যবহারিক পরাজগতের আভাস যদি একেবারেই না থাকতো—তাহলে কেহই এদের কল্পনা-বিলাসের বেশী কিছু বলে মনে করতো না। কারণ এদের বিজ্ঞানের মতো ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকার-রূপে দেখা স্বাভাবিক নয়। যাঁরা এইভাবে দেখেন—এবং তাঁদের মধ্যে কবি ও দার্শনিকও আছেন—তাঁরা মূল্য-অর্থে ব্যবহারোপযোগিতা—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই দেখেন। যে-কবি বা দার্শনিক এই মতানুবর্তী তাঁর কাব্য বা দর্শন বিজ্ঞানের মতোই বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং জীবনের সমসাময়িক কোন প্রয়োজন-সাধন করলেও যথার্থ কাব্য বা দর্শন-পদবাচ্য হয় না।

তাহলে এখানে প্রশ্ন ওঠে কাব্য ব্য দর্শন বলতে কি বুঝি? কাব্য বলতে আমরা সেই শব্দ-রচনাকে বুঝি—যা তাদের অর্থ ও ধ্বনির মাধ্যমে আমাদের চিত্তে কোনো স্থায়ী ভাবকে উদ্বুদ্ধ করে। একটি কাব্যে অনেকগুলি ভাবেরই রূপায়ন হয়ে থাকে কিন্তু তাদের ভেতরে একটিই প্রধান হ'য়ে চিত্ত জুড়ে থাকে এবং আর সবগুলি সেই প্রধান ভাবটির পরি-পোষক হয়। এই প্রধান ভাবটি সাধারণতঃ মানব-হৃদয়ের কোনও গভীর ও ব্যাপক আবেগ হয়, যেমন রতি, শোক, ক্রোধ ও ভয়—এবং অলংকার-শাস্ত্রে এদের 'স্থায়ীভাব' বলা হয়। এদের পরিপোষক আবেগগুলিকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। এরা মানব-হৃদয়ের অপেক্ষাকৃত অগভীর ও চঞ্চল ভাবসমূহ যেমন "রতি" স্থায়ীভাবের সঞ্চারী-হিসেবে আকাঙ্খা, লজ্জা, হর্ষ অস্থিরতা ইত্যাদি। এখন এই সঞ্চারী ভাবগুলির রূপায়ন শব্দ-দ্বারা সরাসরিভাবে হতে পারবে—কিন্তু তাদের অভিব্যক্তি আরও প্রাণবন্ত হয় বিভাব ও অনুভাবের মাধ্যমে। যে-বস্তু বা চরিত্রকে অবলম্বন করে কোন ভাব জাগে তাকে "বিভাব" বলে—যেমন চন্দ্রালোক, তরুমর্মর, নায়ক নায়িকা। কোনো আবেগের যে স্বাভাবিক শারীরিক প্রকাশ—তাদের "অনুভাব" ব'লে—যেমন অশ্রুপাত, হাস্য ও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী। এখন উপযুক্ত বিভাব অনুভাবের মাধ্যমে উপযুক্ত সঞ্চারীভাবের অভিব্যক্তি করা এবং তাদের দ্বারা একটি স্থায়ীভাবের পাঠক চিত্তে উদ্বোধনা করাই কাব্যের ধর্ম। এই কার্যে শব্দগুলির নিজস্ব ধ্বনি ও তাহাদের পরস্পরের সংমিলনে ছন্দ ও মিল—এদেরও বেশ কিছু অংশ আছে—কারণ এদেরও আবেগ জাগাবার শক্তি আছে। যাইহোক আমরা এই দেখতে পাই যে কাব্যের ধর্ম ভাবের অভিব্যক্তি-সাধন এবং একেই রসসৃষ্টি বলে কারণ ভাবের আস্বাদনই রসপ্রতীতি। এখন এইসব ব্যাপারের মধ্যে আমরা জীবনের পক্ষে উপযোগী কিছু পাই না। বরং ভাবালুতা সেইদিক হ'তে অনুপযোগী বা ক্ষতিকর। কাব্যানুশীলন মানুষকে ভাবালু ও স্পর্শকাতর করে তোলে—অথচ জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য চাই বুদ্ধি ও পৌরুষ। কাব্যকে তাই অনেকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন—এ যে মানুষের দুর্বলতার পরিপোষক। তাছাড়া সব ভাবগুলিই নিরপেক্ষভাবে কাব্যের উপাদান। কাব্যে রতি, ভয়, ক্রোধ—সমান আদর পায় শম, উৎসাহ আদি সদ্‌ভাবের পাশে। বরং কাব্যে

শৃঙ্গার-রসেরই তো প্রাধান্য কারণ ভাবের মধ্যে রতিই মানুষের সবচেয়ে আদিম ও ব্যাপক ভাব। এ ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে কাব্য কি মঙ্গল-সাধন করতে পারে? কেউ কেউ বলেন ভাবোপভোগই তো একটি সুখকর ব্যাপার এবং কাব্য তাই মানুষের একটি প্রয়োজন-সিদ্ধি করে—কারণ আমাদের জীবনে আমরা সবসময় সবগুলি ভাবের আস্বাদন করতে পারিনা। কিন্তু সবভাবই কি আমাদের জীবনের উপযোগী? ভয়, ক্রোধ, শোক এরা কি কাজে লাগে? কাব্য তো শুধু রতি, উৎসাহ ইত্যাদি সুখকর ভাবগুলিকেই রূপায়ন করে না? এর উত্তরে অনেকে বলেন অরুচিকর ভাবগুলিও কাব্যের মাধ্যমে যখন পাই তাদের রূপান্তর ঘটে। তখন আমরা সেগুলিকেও উপভোগ করি এবং তাদের সম্যক পরিচয় পাই। এই উপভোগজনিত আনন্দ ও জ্ঞান দুই-ই আমাদের জীবনে উপযোগী। কাব্য তাই আনন্দের মধ্য দিয়ে একপ্রকার জ্ঞান দান করে। আমাদের ভাবগুলির জ্ঞান—যা দিয়ে আমরা আমাদের ও অপরের চিত্তবৃত্তি-সম্বন্ধে বেশী অবহিত হই—এবং যে-অবহিতি জীবন-ধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু কাব্যের এই ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ যথার্থ নয়। রসোপলব্ধি স্বীকার করা যায় এবং এর পরিপোষক-রূপে কাব্যকে গ্রহণ করা যায় এবং যে-পরিমাণে এই রসসম্ভোগ জীবনের পক্ষে উপযোগী সেই পরিমাণে কাব্যের উপযোগিতাও স্বীকার করা যায়। কিন্তু রস কি সম্পূর্ণভাবে জীবনের উপকারে লাগে? এ কি কিছুমাত্রায় মানুষকে অলস ও তরল করে দেয় না? আবার যেহেতু কাব্যের উপকরণ, তার বিভাব ও অনুভাব, সমস্তই কল্পনাকৃত এবং ভাবগুলি কোন বাস্তব-ব্যক্তির নয় বরং ভাবের সাধারণীকৃতি-মাত্র। কাব্যানুশীলন কি মানুষকে বাস্তব-বিমুখ করে না? আর ভাবগুলির জ্ঞানলাভের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য এই যে সে-জ্ঞানের জন্য আমরা মনস্তাত্ত্বিকের কাছে না গিয়ে কবির কাছে যাই কেন? কবি অনেক দেখে সঠিক বর্ণনা করতে পারেন আবার নাও পারেন কারণ তিনি কল্পনা-প্রবন, এবং তথ্যের যাথার্থ্য তাঁর লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য রস। কাব্যকে ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বলে দেখলে কাব্যকে ভুল বোঝা হবে এবং যে মনস্তত্ত্ব শেখা যাবে তা' নির্ভরযোগ্য হবে না। কার্যতঃ এই রকম মনস্তত্ত্ব-শিক্ষা অনেকেই করে থাকেন কিন্তু তাঁদের সে-শিক্ষার উপযোগিতা খুব কমই হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয় কারণ কোনও শিক্ষার উপ-যোগিতা নির্ভর করে তার সত্যের ওপর। কাব্য হ'তে আহরিত কোনও মনস্তত্ত্বের সূত্রের পর বিশ্বাস অতি সহজে আসে কিন্তু বিশ্বাস ও জ্ঞান এক কথা নয়।

কাব্যের উপযোগিতা প্রমাণ করতে গিয়ে অনেকে বলেন এতে অনেক দার্শনিক ও নীতি-তত্ত্বের কথা থাকে যা মানুষকে জীবন-যাপনে সাহায্য করে। কিন্তু এ ও ভ্রান্ত ধারণা—কারণ কাব্যে কোন তত্ত্বই তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয় না। সেখানে তত্ত্বকথা কোন ভাবকে প্রকাশ করবার উপায়-রূপেই ব্যবহৃত হয়—যেমন নাটকে নায়কের বিচার-সমূহ। নায়কের দার্শনিক মতামতকে কবির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। গীতি-কাব্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য কারণ সেখানেও রসই তার লক্ষ্য এবং কবিতার "আমি" ইতিহাসের কোনও

ব্যক্তিই নন্। সুতরাং বাস্তবরূপে বা চিন্তাশীল মানুষ-হিসাবে কবি কিছুই বলেন না এবং তাই তাঁর কোনও মতামতেরই সত্যাসত্যের প্রশ্ন ওঠে না। কাব্যের রসোপলব্ধির জন্য কাব্যে বর্ণিত কোনও মতামতকে সাময়িকভাবে স্বীকার করে নিতে হয়—যেমন নিতে হয় তার আখ্যানভাগকে। কিন্তু এই স্বীকৃতিকে যদি বিজ্ঞানের কোনও তথ্যের স্বীকৃতির রূপ দেয়া হয়—অর্থাৎ যদি কাব্যকে সমাচার-পত্র বা বিজ্ঞানের মতো পাঠ করা হয়, তাহলে কবি ও কাব্যকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা ও ছোট করা হবে। অনেক রচয়িতাই এরূপ ভুল ধারণা-বশতঃ কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে ছন্দে মিলে অকাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং রসকে গৌণ করে তথ্য ও তত্ত্বকে দিয়েছেন প্রাধান্য। এরূপ কাব্য (কিংবা যথার্থ কাব্য কিন্তু তার মধ্য বর্ণিত বিচার-সামগ্রীকে পাঠক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচারের মতোই গ্রহণ করেছেন) মানুষকে ও ঐ ধরণের পাঠককে জীবন-ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এখানে এখন প্রশ্ন এই যে এরূপ কবি বা পাঠকের পক্ষে সৃষ্টি ও গ্রহণের দোষে যে উপযোগিতার উদ্ভব হচ্ছে—তা কাব্যের উপযোগিতা বলে পরিগণিত হতে পারে কিনা? যে পরিমাণে কবি তাঁর কাব্যকে দর্শন করে তুলেছেন—তাঁর কাব্যের উপযোগিতা তাঁর দর্শনেরই উপযোগিতা এবং যে-পরিমাণে পাঠক কোনো কাব্যের সামগ্রী-হিসেবে ব্যবহৃত কোনও দার্শনিক বিচারকে সত্য বলে গ্রহণ করে লাভবান হয়েছেন তার মূল্য কিন্তু তাঁরই প্রাপ্য। কারণ কবি সেই বিচারকে ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁরই জীবন-দর্শনের একটি অংশ বলে মানবেন না। কবি কাব্যে আত্মগোপনই করেন, নিজকে প্রকাশ করেন না। কাব্যের মধ্যে কোন যথার্থ কবির ব্যক্তিত্বকে খুঁজতে যাওয়া ভ্রমমাত্র। এই ব্যক্তিত্ব তাঁর কাছেও অজানা—কারণ কবির নিজের ব্যক্তিত্বকে দূরে সরিয়ে নানা ভাব-ভাবনার সঙ্গে একাত্মবোধ করাই কবির কাজ এবং এই কর্মে যিনি সর্বক্ষণ ব্যাপৃত তাঁর আত্মপরিচয় তাঁর নিজের কাছেই ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যায়। কবির নিজের বর্ণনা থেকে তাঁর চরিত্র, ভাব ও ভাবনা কিছুই সঠিক বোঝা যায় না। কবির ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে তাঁর রচনায় বর্ণিত এমন মতামতের সঙ্গে (যা তাঁরই বলে স্বভাবতঃ মনে হয়) তাঁর বিশেষ কোনও সম্বন্ধই নেই। এমন কি তাঁর আত্মজীবনীতেও সরাসরিভাবে বর্ণিত অনেক মন্তব্যই প্রকৃত পক্ষে তাঁর নয় বরং কাব্যিক। এসবের কারণ এই যে কবির নিজের কোনও ব্যক্তিত্ব রূপ গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর নিজের কোনও সঠিক প্রকৃতি, জ্ঞান, কর্ম বা বিশ্বাস নেই। এই কারণে অনেকে কবিকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।

এখন দেখা যায় কাব্যের উপযোগিতা কিছুটা আসে যখন তাকে দর্শনের পর্যায়ে ফেলা হয়। কিন্তু এ উপযোগিতাই বা কি প্রকারের? কাব্যে যে দার্শনিক মতামতের অবতারণা হয় তাতো আদ্যোপান্ত বিচারপ্রসূত নয়—যেরকম যথার্থ কোনও দর্শন-গ্রন্থে থাকে। এরা সাধারণতঃ কবির বিশ্বাসহিসাবেই প্রকাশিত ও গৃহীত হয়। সে হিসাবে এদের দার্শনিক বিচার বললেও—এই দর্শন যে যথার্থ দর্শন নয় বরং গোঁড়ামী-মাত্র—যাকে গৌরবান্বিত করতে

হলে বলতে হয় বুদ্ধি অতিরিক্ত বোধি দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। অথচ এই বিচার-নিরপেক্ষ জ্ঞান এমন বিষয়ের যা আমাদের ব্যবহারিক জগতের কাজে লাগে—যা আমাদের জীবন-যাপনের রীতি-নীতির শিক্ষা দেয়। এখন প্রশ্ন এই যে এই তথাকথিত জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ধারিত হবে কেমন করে? এ প্রশ্ন আরও ওঠে এই জন্য যে একই সময়—একই সমাজ-অবস্থায়, দুই তিন জন কবি দুই তিন রকম কথা বলেন। নানা মুনির নানা মত এবং কবিদের যদি মুনি বা দ্রষ্টা বলে মেনে নিই—তাহলে দুইটি পরস্পর-বিরোধী কবির মধ্যে কাকে গ্রহণ করব? যুক্তিতর্কের কোনও অবলম্বন এঁরা নেন না বলে এঁদের মতামতের সত্যাসত্য নির্ধারণ-করা অসম্ভব। সুতরাং এইসব মতামতের উপযোগিতা কতোখানি তা' কে বলবে? আপাতভাবে কোনও এক কবির মতামত তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে খুব উপযোগী মনে হলেও—সত্যই তাঁদের উপকার হচ্ছে কিনা এর বিচার সম্ভব অনেকদিন পরে। অনেক দিন হতে বিচার করে যদি কোনও মতের উপযোগিতা তার গ্রহণকারীদের সাময়িক ভালো-লাগা বা কোনও একদিকের স্বার্থ-সাধন দিয়েই বিচার করা হয়—তাহলে সে-উপযোগিতা আপেক্ষিক-মাত্র হয়ে যায় এবং ফলতঃ সেই কাব্যের উপযোগিতাও সর্বসাধারণ ও ধ্রুব থাকে না। তাছাড়া যেহেতু একই সময় রচিত দুইটি কাব্যে পরস্পর বিরোধী মতের প্রকাশ দেখা যায়—সাধারণভাবে কাব্যের উপযোগিতা আছে একথা বলা যায় না। বরং বলতে হয় যে কোনও এক সময় কোনো এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কোনও একটি কাব্য উপযোগী হয় এবং অন্যান্য অনেক কাব্য ক্ষতিকর হয়। কাব্যের তথ্য ও অংশকে প্রাধান্য দিয়ে তার উপযোগিতা প্রমাণ করতে গেলেই দেখা যায় এই প্রয়াসের ফল বিপরীতই হয়েছে। কাব্যের উপযোগিতা-প্রমাণে যত্নবান অনেক কবি ও দার্শনিক তাই কাব্যকে রস-পরিবেশক-রূপেই দেখেছেন—তথ্য বা তত্ত্ব-নির্দেশক-রূপে নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি রস-পরিবেশক হিসেবেও কাব্যের উপযোগিতা সন্দেহাতীত নয়—কারণ জীবন-ব্যাপারে রসের উপকারিতা কিছুটা স্বীকার করলেও তাহার অপকারিতাও অনস্বীকার্য।

সুতরাং দেখা গেলো যে কাব্যের উপযোগিতা বিশেষ কিছুই নেই। দর্শনের উপযোগিতা কোথায়? 'দর্শন' অর্থে যদি অনুভূতি বা বোধি-নির্ভর কাব্য বা ধর্ম-শাস্ত্র হতে ভিন্ন বুদ্ধি-নির্ভর, বিচার-পূর্ণ একটি মানস-ব্যাপার মনে করি, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই মেলে। কারণ বুদ্ধি-বিচার-দ্বারা দু'টি ব্যবহারিক-জগৎ-সম্বন্ধীয় মতের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত সত্য এর নিরূপণ করা যায় কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতের কোনও প্রশ্নেরই মীমাংসা হয় না। কারণ বুদ্ধি-বিচার কাজ করে ইন্দ্রিয়-জনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়-বস্তুর ওপর ভর করেই। জ্ঞান বুদ্ধির নিজস্ব দান এইটুকুই যে সে প্রত্যক্ষলব্ধ সামগ্রীকে গুছিয়ে ধরে কয়েকটি নিয়মে এবং এরূপে এদের কিঞ্চিৎ ঐক্য-সাধন করে এদের বৈচিত্র্য বুঝতে পারে। এই নিয়মগুলির মধ্যে দেশ-কাল, কার্য-কারণ ও গুণ-গুণী সম্বন্ধ প্রধান। সে যাই হোক আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ কোনও বস্তুর কোন জ্ঞানই পেতে পারিনা

অথচ দর্শনের প্রধান লক্ষ্য এই বিজ্ঞানোত্তর পারমার্থিক জ্ঞান। এই আদি-বিরোধ দর্শনের মূলেই। তাই দর্শন যেখানেই প্রকৃত দর্শন হয়েছে—অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞান খুঁজেছে—সেখানেই ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা এড়াতে গিয়ে দর্শন হয় কাব্য বা ধর্ম-শাস্ত্রের মতো বুদ্ধি-বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং ফলতঃ নানা পরস্পরবিরোধী মতের সমষ্টি ও অশেষ তর্কজালের সৃষ্টি করেছে—নয় করেছে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে তারই সেবা—পারমার্থিক সমস্ত ভান ত্যাগ করে। দার্শনিক কোনও মত তাই ঠিক দার্শনিক মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করলে কাব্যের মতোই কিছুই নিশ্চয় করে বলে না—শুধু প্রকল্পরূপে উপস্থাপিত করে মাত্র। মতটির পক্ষে ও বিপক্ষে নানান যুক্তি দেখানোই দর্শনের কাজ এবং যেহেতু একটি মতের স্বপক্ষে অসংখ্য যুক্তি থাকলেও তারা সকলে মিলে তাকে সত্য বলে প্রমাণিত করতে পারে না—এবং বিপক্ষেও অসংখ্য যুক্তি থাকতে পারে—যদিও তাদের সন্ধান হয়তো এখন পাওয়া যায় নি—সেজন্য দর্শন কখনোই নিশ্চয় জ্ঞান দিতে পারে না। এই জন্য যদিও আমরা বলি "বিজ্ঞান এই কথা বলে", "দর্শন এই কথা বলে" এমন বলি না। কারণ বিজ্ঞানের মতো দর্শন কোন সর্বজন-স্বীকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার আবিষ্কার করে না যার থেকে সকল মানুষই নিজের জীবনের প্রয়োজন-অনুযায়ী কিছু না কিছু আহরণ করে। দর্শন নানা মতের উদ্ভাবন করে এবং এদের পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করে—কিন্তু কোনটি সত্য তা' বলে না। সুতরাং এর উপযোগিতা কোথায়? তাছাড়া কোন পরমার্থিক তত্ত্বের উপযোগিতা জীবনের পক্ষে সত্য কোথায় তাও বিচার্য। কিন্তু তবুও দর্শনকে জীবনের কাজে লাগানো হয়—এটা সম্ভব হয় দর্শনের কোনও মতকে দার্শনিক মনোভাব নিয়ে একটি প্রকল্প-রূপে গ্রহণ না করায়—এবং তাকে বিজ্ঞানের কোনও তথ্যের বা অলৌকিক জ্ঞানজনিত কোনও তত্ত্বের আকারে দেখায়। দর্শনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিকে উপেক্ষা করেই দর্শনকে এরূপ কাজে লাগানো হয়। কিন্তু এর ফলে দর্শনের উপযোগিতা কাব্যের মতোই তার সত্যের ওপর নির্ভর না করে কোনও শ্রেণীবিশেষের ভালো লাগা বা তার কোনও স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে লাগার ওপর নির্ভর করে। এবং এর ফলে উপযোগিতার মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পায়, কারণ তা' আপেক্ষিক হয়ে পড়ে। কাব্যের মতোই তাই দর্শনকেও জীবনের উপযোগী-রূপে প্রমাণ করতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র এবং অনেকে তাই একে অব্যবহার্য বলেই স্বীকার করে এর স্বরূপ রক্ষা করেছেন।

কিন্তু তাই বলে কি কাব্য ও দর্শনের মূল্য নেই? যদি জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়-হিসাবেই কোন বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয়—তাহলে এদের বিশেষ মূল্য নেই। যেটুকু আছে তা' আমাদের চিত্ত-বিলাস হিসেবেই। কারণ কাব্যের রস-চর্বনা আর দর্শনের নিছক প্রকল্প সৃষ্টি ও যুক্তিতর্কের জালবোনা দুই বস্তু-নিরপেক্ষ মানস-ব্যাপার যা কতকটা ক্রীড়ার মতো অবসর-বিনোদনের উপায়-রূপেই জীবনের কাজে লাগে। অনেকে বলেন এরা আমাদের কল্পনা-শক্তি ও চিন্তা-শক্তিকে সহায়তা করে যেমন দেহশক্তি ও কার্যক্ষমতাকে করে

ক্রীড়া। কিন্তু এও খুব বড়ো কিছু নয়—যেমন দেহ-শক্তি ও কার্য-শক্তির ব্যায়াম ও উন্নতি-সাধনের প্রকৃত স্থলই বাস্তব-জীবনের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম তেমনি মানসিক-শক্তির ক্ষেত্রেও।

সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমেই আমাদের কল্পনা ও চিন্তাশক্তি জাগরিত ও উন্নত হয়। সুতরাং দেখা যায় কাব্য ও দর্শনের মূল্য বিশেষ কিছুই নেই যদি জীবন-ক্ষেত্রে উপযোগিতাই মূল্যের মাপকাঠি হয়। *কিন্তু মূল্যের এই সংজ্ঞা কি সম্পূর্ণ?* আমরা কি জীবনের অতিরিক্ত কোনও শ্রেয়কে জানি না? জীবন-সম্পর্কহীন কোনো কিছুই কি মূল্যবান নয়? এ প্রশ্ন সাংঘাতিক। জীবনের বাইরে দাঁড়িয়েই এ প্রশ্ন অকপট ও অর্থপূর্ণভাবে করা যায়—আর যদি তা করা যায়—তো তার উত্তরও পাওয়া যায়। সে উত্তর হবে—হ্যাঁ, কিছু মূল্য আছে এদের এবং সে মূল্য শুধু জীবনকে বাইরে থেকে দেখার আনন্দ, তাকে কাব্যের বিষয়-বস্তু-রূপে ধরে তার রসোপলব্ধি! আনন্দ দেয় কাব্য আর জীবনকে একটি গণিতের প্রকল্প রূপে দেখায় ও তার আপেক্ষিকতা উপলব্ধি করায় দর্শন। জীবনের ভিতরে দাঁড়িয়ে জগৎকে দেখায় মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান। জীবন ও জগৎ তখন মনে হয় একমাত্র সত্য। জীবনের প্রয়োজনে লাগে এই জগৎ—যার সঙ্গে তার বোঝাপড়া, যুদ্ধ-ভালোবাসা, আশা-নৈরাশ্যের নানান্ খেলা চলছে জীবনের আদি হতেই। জীবনের ভিতরে থেকে কাজ করে চৈতন্যের একটি স্তর। জ্ঞান-বিজ্ঞান তারই সৃষ্টি। জীবনের বাইরে থাকে চৈতন্যের আর একটি স্তর। সে কেবল দেখে। এই দেখার জন্যই বুঝি সে এই জীবন ও জগতের সৃষ্টি করে। "রসো বৈ সঃ" উপনিষদের ঋষি বলেছেন। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের কথা মনে হয়। একজন জীবন ভোগ করে অপর জন তাই দেখে মাত্র আর আনন্দ পায়। এই দেখা আর এই আনন্দ লৌকিক নয়। এই দেখা ও আনন্দের উদ্দেশ্যেই যথার্থ কবি ও দার্শনিক তাঁদের কাব্য ও দর্শন-রচনা করেন এবং এরই উদ্দেশ্যে আমরাও এই কাব্য ও দর্শন-পাঠ করি। কিন্তু যেহেতু এ-উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়, কারণ কার্যতঃ আমরা জীবন-ধর্মী ও বাস্তব-পন্থী, সেইজন্য কাব্য ও দর্শনের মূল্য নিয়ে এতো ভুলভ্রান্তি ও বাদ-বিসংবাদের অবকাশ। এবং যে-পরিমাণে কাব্য ও দর্শন আমাদের এই জীবন-সর্বস্বতাকে দূর করতে সমর্থ হয় এবং চৈতন্যের আর এক দিক খুলে দেয়—যেখান দিয়ে আর এক জীবন আর এক জগৎ দেখতে পাই, সেই পরিমাণে এই দুটি মানস-ব্যাপারের আর এক অর্থে উপযোগিতা ও মূল্য।

কেইন্‌সীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে

শ্রীদেবপ্রসাদ সিংহ—প্রাক্তন ছাত্র (১৯৪৩-৪৯)

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আলোচনাপ্রসঙ্গে আজ কেইনসীয় মতবাদের অবতারণা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই অপরিহার্যতার অন্যতম প্রধান কারণ কেইন্‌সের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী যার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র তার পুনরুজ্জীবনশক্তির সন্ধান লাভ করেছে বলে কেইন্‌সবাদীরা দাবী করেন। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে কেইন্‌সীয় মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার একটু সমালোচনা করব।

কেইনসীয় মতবাদের অভিনবত্ব বুঝতে গেলে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির মূলসূত্রগুলির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় আবশ্যক। এই অর্থনীতিবিদ্‌রা ধরে নিয়েছিলেন যে দেশে সমস্ত উৎপাদকগুলি (factors of production) সম্পূর্ণভাবে কাজে নিযুক্ত। পূর্ণ-নিয়োগ ভারসাম্যই (Full employment equilibrium) অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি, অনুনিয়োগ (under-employment) অস্বাভাবিক এবং অস্থায়ী। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির এই স্বীকৃতির (assumption) মূলে আছে Say'র নিয়ম, 'Supply creates its own demand'—অর্থাৎ, 'যোগান নিজেই তার চাহিদা উৎপন্ন করে'। কর্মহীনতা (unemployment) দুইপ্রকারের (১) ঐচ্ছিক (voluntary) এবং (২) সাময়িক (temporary অথবা frictional)। অনৈচ্ছিক কর্মহীনতা বা Involuntary unemploymentকে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা স্বীকার করেন নি। রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা বা Laissez-faireএ তাঁদের ছিল অটুট বিশ্বাস। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কর্মহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে তাঁরা নির্দেশ করেছেন। Minimum wage-laws প্রভৃতি রাষ্ট্রিক আইন, ট্রেড ইউনিয়নের সেই ধরণের অনমনীয়তা যা মজুরীর হারকে অস্বাভাবিক উপায়ে বর্ধিত রাখতে চায়, সমাজবীমার বহুলপ্রসার প্রভৃতি বাহ্যিক কারণে যোগান এবং চাহিদার স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়, এবং তার ফলেই কর্মহীনতার উৎপত্তি। কখনও আবার চাহিদার পরিবর্ত্তন হয় এবং যোগান ও চাহিদার মধ্যে অসঙ্গতির ফলে কর্মহীনতা দেখা দেয় (frictional unemployment)। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় যদি যোগান এবং চাহিদার সম্পর্ক বাহ্যিক কারণে ব্যাহত না হয়, তবে পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যই স্থায়ী ব্যবস্থা। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির তত্ত্বগুলোতে সেইজন্য পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ অ্যালফ্রেড্ মার্শাল এবং এ, সি, পিগু এই ক্লাসিকাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কেইন্‌স ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির বিরুদ্ধে যে সব সমালোচনা করেছেন, তার অধিকাংশই অধ্যাপক পিগুর লেখাকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য যে কেইন্‌স এবং অধ্যাপক পিগু দুজনেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং উভয়েই আলফ্রেড মার্শালের ছাত্র। সুতরাং চিন্তাধারার দিক থেকে বিচার করলে কেইন্‌সকে বিদ্রোহী বলা যেতে পারে।

আমরা এখন সংক্ষেপে কেইন্‌সীয় মতবাদের পরিচয় দেব। ১৯২৯ সালের বিশ্বজোড়া সাধারণ অর্থনৈতিক সংকট এ মতবাদের উদ্ভবের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বা প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতাধর্মী বিশ্লেষণ ইত্যাদি যখন সংকটের আসল কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হল তখন নূতন পন্থানুসরণ হয়ে উঠলো অনিবার্য এবং সেই অনিবার্যতাতেই কেইন্‌সবাদের উদ্ভব।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ Say'র নিয়মকে অস্বীকার করে কেইন্‌স বিশ্বের দরবারে উপস্থিত হলেন। অনুনিয়োগের অস্তিত্বই যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ধনতন্ত্র যে পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যে সাধারতঃ পৌছুতে পারে না, কেইন্‌স সর্বপ্রথমে এটাই প্রমাণিত করলেন।

কেইনসীয় বিশ্লেষণে নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সক্রিয় চাহিদা বা Effective Demandএর পরিমাণের দ্বারা। 'সক্রিয় চাহিদা' কেইনসীয় বিশ্লেষণের ভিত্তিস্বরূপ এবং এই সক্রিয় চাহিদার নিয়মের উপরেই কেইন্‌সীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। সক্রিয় চাহিদা (বাঞ্ছিত) পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যের পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণের হলে পূর্ণনিয়োগ, তার চাইতে কম হলে কর্মহীনতা এবং তার চাইতে বেশী হলে Inflation হতে বাধ্য।

আয়ের খরচের দ্বারাই সক্রিয় চাহিদা প্রকাশ লাভ করে। এখন আয় বা Incomeএর পরিমাণ নির্ধারিত হয় সরাসরি ভাবে ভোগ্যবস্তু (consumer's goods) এবং ভোগোকরণ প্রস্তুতকারক বস্তুর (Investment goods বা capital goods) উৎপাদনের পরিমাণের উপর। আয়কে Yএর দ্বারা, সরাসরিভাবে ভোগ্যবস্তুকে Cএর দ্বারা এবং ভোগোপকরণ-প্রস্তুতকারকবস্তুকে Iএর দ্বারা সূচিত করলে সমীকরণটি দাঁড়ায় $Y = C + I$ এখন 'C'কে যদি 'Y'এর উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা যায়, এবং C এবং Yএর পারস্পরিক সম্বন্ধটা যদি জানা থাকে অর্থাৎ যাকে অর্থনীতিবিদ্‌রা C(Y) বলে অভিহিত করে থাকেন সেটা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তবে Iএর পরিমানের দ্বারা আয় কিংবা সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিবর্তন অনুযায়ী পুরানো ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে C(Y)এর 'level'টা সাধারণতঃ নীচু ও মূলধন নিয়োগ মুনাফার উপর নির্ভরশীল হওয়াতে, I অংশটি অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল এবং যুদ্ধকালীন কিংবা যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব সময় ছাড়া, পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে নিতান্তই স্বল্প। অতএব, অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র যে স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যে পৌছাবে এমন মনে করার কারণ নেই।

সামাজিক উৎপাদন এবং নিয়োগনিয়ন্ত্রণে তিনটি প্রধান নিরপেক্ষ নির্ধারকের (In-

dependent variable) উপরই লর্ড কেইন্‌সের বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত—(১) আয়-অপেক্ষ ভোগ (Marginal propensity to consume) (২) মূলধনের প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয় (Marginal efficiency of capital) (৩) কাঁচা টাকার চাহিদা বা Liquidity Preference.

(১) আয়অপেক্ষ ভোগ (Propensity to consume) বলতে বোঝায় ভোগোপকরণের উপর ব্যয় এবং আয়ের পারস্পরিক অনুপাতকে। মানুষের অভাববোধ সীমাহীন নয়, কাজেই আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগোপকরণে ব্যয়িত অংশের পরিমান কমতে থাকে। "The higher the income, the lesser the propensity to consume", এবং এই আয় এবং ভোগের পারস্পরিক অনুপাতের একটি ব্যক্তিক এবং সামাজিক তালিকা প্রস্তুত করা পরিসংখ্যান শাস্ত্রের সাহায্য সম্ভবপর। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধন বণ্টনের অসাম্যের জন্য উপরোক্ত সূত্রের পরিণতি হচ্ছে সমাজের উচ্চবিত্ত-শ্রেণীর ধনসঞ্চয়—এবং সঞ্চিত ধন Capital goods ক্রয়ে ব্যয়িত না হলে স্থায়ী সামাজিক অনুনিয়োগ।

এখন এই সঞ্চিত অর্থের—Capital goods খাতে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে (২) মূলধনের প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয়ের উপর। মূলধনের প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয় বলতে বোঝায়—ঐ মূলধন capital assets-এ নিযুক্ত হওয়ার পরবর্তী মুনাফা-প্রত্যাশা যাকে বলা হয়েছে Prospective yield of the capital assets এবং এই capital assets-এর সরবরাহ মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে।

আয়-অপেক্ষ ভোগ ও মূলধনের প্রান্তিক প্রত্যাশিত আয়ের যৌথ কার্যকারিতা, কেইন্‌সীয় বিশ্লেষণে স্থায়ী "অনুনিয়োগের" জন্ম দিতে বাধ্য এবং মূলধনের প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয়ের আকস্মিক অবনতিই (Sudden collapse) হল বাণিজ্য-সংকটের জনক।

উপরোক্ত দুটি নির্ধারক (৩) কাঁচা টাকার চাহিদা (Liquidity preference) দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। সাধারণতঃ লোকের আয়ের একটা অংশকে কাঁচা টাকায় ধরে রাখার একটা প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তির জন্ম হল ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার মধ্যে। ব্যবসায়ের উন্নত অবস্থায় এই Liquidity preferenceএর জোর থাকে অল্প এবং এই প্রবৃত্তি জোরদার হয়ে ওঠে বাণিজ্যিক অবনতির মুখে। সুদের হার এই প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতার জন্যই সংকটের মুখে সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, যার ফলে অবস্থার অবনতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।

"কর্মহীনতা" সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকাল মতবাদের উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। ক্ল্যাসিকাল মতবাদ অনুযায়ী 'কর্মহীনতা' ঐচ্ছিক (voluntary) এবং wage-rate এর অনমনীয়তা (rigidity) প্রসূত। wage-rateকে উপযুক্ত পরিমাণে নমনীয় (flexible) করতে পারলে 'কর্মহীনতা' সমস্যার সমাধান হয়। কেইন্‌স প্রমাণ করলেন অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রে

অনৈচ্ছিক কর্মহীনতা (Involuntary) একটি মূল সমস্যা এবং উপযুক্ত পরিমান নমনীয় wage-rate এর দ্বারাই 'কর্মহীনতা' সমস্যার সমাধান হবে না।

ধনতন্ত্রের এই গলদকে দূর করার জন্য কেইন্‌স যে প্রস্তাব করেছেন সংক্ষেপে তার একটু উল্লেখ করা যাচ্ছে। তাঁর ব্যবহারিক সমাধানগুলি এরকম। (১) পুনর্বণ্টনক্ষম করনীতির (Redistributive taxation) দ্বারা সামাজিক আয়কে নিম্নবিত্তশ্রেণীর মধ্যে চারিয়ে দেওয়া যার ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে আয়-অপেক্ষ ভোগের হার (Consumption function)। আয় যত কম, আয়ের তত বেশী অংশ ভোগে ব্যয়িত হয়। সুতরাং ধনবণ্টনে অসাম্য যত কমবে আয়-অপেক্ষ ভোগের হার তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। (২) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দ্বারা মূলধনের বিনিয়োগবৃদ্ধি। যথা "মূলধনের সামাজিক বিনিয়োগ", "কিছু সংখ্যক শিল্পের জাতীয়করণ", "সামাজিকভাবে সুদের হার বিনিয়ন্ত্রণ" ইত্যাদি। (৩) কেইন্‌সীয় বিশ্লেষণে বাণিজ্যসংকট (যার উৎপত্তি হল, "from the sudden collapse in the marginal efficiency of capital") রুখ্‌বার উপায়—বাণিজ্যিক উন্নতিকালে (during booms) সুদের হার কমিয়ে দেওয়া, যার ফলে "booms"টি quasi-boom হিসাবে স্থায়ী হতে পারে।

কেইন্‌সীয় মতবাদের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এবারে মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খানিকটা সমালোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার করব।

কেইন্‌সীয় অর্থনীতি ধনতন্ত্রের ধারক। কি করে আভ্যন্তরীণ গলদগুলি দূর করে ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা যায় সেটাই হল কেইন্‌সীয় মতবাদের মূল লক্ষ্য। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কেইন্‌সের বিশ্লেষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

মার্ক্সবাদীদের প্রধান আপত্তি এই যে কেইন্‌সীয় মতবাদ তাঁর পুরোগামী 'ধনতান্ত্রিক' অর্থনীতিবিদ্‌দের মতই 'মনস্তত্ত্বধর্মী' ; সুতরাং ধনতান্ত্রিক সমাজে যে মানসিকতা চালু রয়েছে তার মূলে যে বাস্তবশক্তি কাজ করছে তা সম্পূর্ণরূপে কেইন্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে এড়িয়ে গেছে।

কেইন্‌সের তিনটি variable এর উৎস-সন্ধান ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থার মধ্যেই মিলবে। আর কেইন্‌সীয় মতবাদের ব্যর্থতার কারণ হল এই বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা সজ্ঞান অস্বীকার।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কেইনসীয় Variable ত্রয়ীকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা যাক। কেইন্‌সীয় মতবাদ অনুযায়ী আয়-অপেক্ষ ভোগ প্রবণতার (consumption function) কার্যকারিতার মূল উৎস সামাজিক ধনবণ্টনে অসাম্য। কিন্তু এই অসাম্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মূলসূত্রের মধ্যেই। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের গোড়ার কথা হল মুনাফার জন্য উৎপাদন। পুঁজিপতি (capitalist) তার মূলধন বা অর্থ পণ্য উৎপাদনে খাটিয়ে আরও বেশী লাভ করে। মার্ক্স দেখিয়েছেন যে, কোন দ্রব্যের মূল্য তার উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রমশক্তি (labour power) ব্যয়িত হয় তার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং পুঁজিপতির মুনাফার উৎস এমন কোন দ্রব্য ক্রয়ে যা সর্বপ্রকার মূল্যের উৎস এবং এই দ্রব্য হল মজুরের শ্রমশক্তি। পুঁজিপতি মজুরের এই শ্রমশক্তিকে ক্রয় করে। শ্রমশক্তির বিশেষত্ব হল যে এটা একমাত্র দ্রব্য যার ব্যবহারিক মূল্য (Value-in-use) বিনিময় মূল্যের (Value-in-exchange) থেকে বেশী। সুতরাং শ্রমিকের বেতন তার শ্রমমূল্য থেকে কম এবং এই বিভিন্নতার মধ্যেই রয়েছে মুনাফার মূলসূত্র। পুঁজিপতির মুনাফা নির্ভর করে শ্রমশক্তির উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value) অপহরণে। অতএব আয় বণ্টনে অসাম্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই নিহিত এবং আয়-অপেক্ষ ভোগের হারের স্তর এই অসাম্যের জন্যই পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য লাভের পক্ষে স্বল্প।

ধনতন্ত্রের উৎপাদন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজ্ঞান-অজ্ঞতাই আবার কেইন্‌সকে মূলধনের প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ খুঁজে পেতে দেয় নি। কেইন্‌সীয় মতবাদে দেখা যায় marginal efficiency of capital—'প্রত্যাশা' (expectations), 'মানসিক অবস্থা' (state of mind), "সাধারণ অবস্থা" (state of confidence) ইত্যাদি "রহস্যময়তা" পরিপূর্ণ বুর্জোয়া মানসিকতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মূলধনের প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে আর্থিক রূপান্তরের দ্যোতক এবং এই রূপান্তরের মূলে কাজ করছে প্রকৃত মুনাফার হার (Rate of profit)।

পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত পুঁজিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়—একটি নির্দিষ্ট (constant) যথা কাঁচামাল, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ; অপরটি পরিবর্তনশীল (variable) যথা শ্রমশক্তি নিয়োগ। উদ্বৃত্ত মূল্য এবং পুঁজির এই দুই অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যেই মুনাফার হারের অবস্থিতি। উদ্বৃত্ত মূল্য "S", পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি "V" এবং নির্দিষ্ট পুঁজি "C" এর দ্বারা সূচিত করিলে সমীকরণটি দাঁড়ায়

$$\text{Rate of profit বা মুনাফার হার} = \frac{S}{c+v}$$

আমরা আগেই দেখেছি যে, উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস শ্রমশক্তির অপহরণ। সুতরাং পুঁজির উপাদানরূপ (organic composition of capital) অর্থাৎ v এবং c এর আনুপাতিক হারে "C" এর পরিমাণ বেশী হলে মুনাফার হার হ্রাস পেতে বাধ্য। মার্ক্স দেখিয়েছেন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি পুঁজিপতিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও মুনাফালিপ্সার মাধ্যমে পুঁজির নির্দিষ্ট অংশের আনুপাতিক ক্রমবর্ধনে বাধ্য। কাজেই দীর্ঘকালীন মুনাফার ক্রমিক হ্রাস (falling rate of profit) অবশ্যম্ভাবী এবং এই হ্রাসই পুঁজিপতির আস্থাহীনতার অন্যতম কারণ।

বাণিজ্যসংকটের উদ্ভবের মূল রহস্যের ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে প্রত্যাশিত প্রান্তিক আয়ের আকস্মিক অবনতিতে নয়—পুঁজিবাদের অন্ধ প্রতিযোগিতার মধ্যে। মুনাফালিপ্সা আনে পুঁজিপতিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায় জন্ম নেয়

উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ এবং উৎপাদন-বৃদ্ধি রূপ নেয় উৎপাদন যন্ত্র ইত্যাদির অতিপ্রয়োগে। এই জাতীয় গতিশীলতার অব্যবহিত ফল হল বাণিজ্য সংকট, কারণ উৎপাদনযন্ত্রে মূলধনের অতিপ্রয়োগের শেষ রূপান্তর হল ভোগ্যবস্তু (Consumer's goods) উৎপাদনে এবং ভোগ্যবস্তু বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে। কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তিকে ক্রমক্ষীয়মাণ করেছে।

এইভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য বাজারে বিক্রয় না করতে পারার মধ্যেই ধনতান্ত্রিক কাঠামোর আসল গলদটা চোখে পড়ে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্বন্ধের অন্তর্বিরোধের পরিণতিই হল দীর্ঘস্থায়ী অনুনিয়োগ ও বাণিজ্যসঙ্কট। এবং এই অন্তর্বিরোধের মধ্যেই রয়েছে সমাজতন্ত্রবাদের ভাবী ইংগিত ও সমস্যা সমাধানে কেইন্‌সবাদের সুনিশ্চিত ব্যর্থতা।

কাঁচা টাকার চাহিদা নিয়ন্ত্রণেও ধনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। কারণ, সুদের হার কমানো-বাড়ানোর মূলগত ব্যাপার হল ধনিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টনের জন্য পারস্পরিক রেষারেষি। কাজেই সমস্যা একই থেকে যাবে, বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি লগ্নী মূলধনের একাধীশ্বরত্বের যুগে।

সুতরাং মার্ক্সীয় সমালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে বুর্জোয়া অর্থনীতির মনস্তাত্ত্বিক বিধিবাদ (methodology) থেকে মুক্তি না পাওয়ার জন্য কেইন্‌সের সমস্ত মৌলিকত্ব সাধারণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে, কারণ সমাজজীবনের গতির মূল উৎসকে কেইন্‌স অবজ্ঞা করেছেন।

আলোচনা

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি

ধ্রুব গুপ্ত—পঞ্চম বর্ষ, কলা।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক সে সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রবন্ধলেখক প্রধানতঃ কবির "পরিচয়" গ্রন্থে সংকলিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামের প্রবন্ধটির উপর নির্ভর করেছেন। বলা বাহুল্য, এতে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয়নি। এ বিষয়ের উপর আমরা আগামী সংখ্যায় অন্যতর তথ্য সম্বলিত আলোচনা আহ্বান করছি। —সম্পাদক।

বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির দ্রুতগতি মানুষের চিন্তাপদ্ধতিতে যে আলোড়ন তুলেছিল ইতিহাসদর্শনও তার প্রভাব এড়াতে পারেনি। বিজ্ঞানের অবাধ জয়যাত্রা মানুষের সব দৃষ্টিভঙ্গিকেই 'বৈজ্ঞানিক' করে। সব রকমের বিদ্যাকেই তাই বিজ্ঞানের মর্যাদার অধিকারী করবার আগ্রহ প্রবল হয়ে দেখা দিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এই আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছিল, আর সেই সঙ্গে প্রবলতর হয়ে উঠল ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ—ইতিহাস শিল্প বা বিজ্ঞান এই তর্কপ্রসঙ্গে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক J. B. Bury ঘোষণা করলেন "ইতিহাস বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানই, তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

অসন্দিগ্ধমনে ইতিহাসকে পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞানের আওতায় ফেলা যায় না, কারণ পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে একটি চরম এবং অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হওয়া ঐতিহাসিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাস যে নিছক শিল্পগোষ্ঠীভুক্ত নয়, এ ধারণা আজ প্রায় সর্বদলীয় চিন্তাতেই স্বীকৃত। শিল্পীর কাজ জীবনসত্যকে (ক্ষেত্র বিশেষে তা ঐতিহাসিক সত্যও হতে পারে) বিশিষ্ট রূপকল্পের মধ্যে রূপায়িত করা। আর ঐতিহাসিকের কাজ মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের (নিছক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নয়—তাই ইতিহাসকে সাংবাদিকতা থেকেও পৃথক করা হয়েছে) ব্যাখ্যা করে জীবনসত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা। এই ব্যাখ্যার কাজে, অর্থাৎ কালধর্মের ভিত্তিতে অতীতের ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণের কাজে বৈজ্ঞানিকসুলভ বস্তুনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবী জোড়া রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক কার্যকলাপ কোন খেয়ালীর অকারণ খেয়ালের বশেই ঘটে না, এদের পেছনেও বিধিনিয়মের পরিচালনা আছে, সমাজবিজ্ঞানী কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ সেই বিধিনিয়ম আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা। ঐতিহাসিকেরও এ জাতীয় দায়িত্ব আছে।

বিউরীর (Bury) প্রতিবাদীরা ইতিহাসকে কেবলমাত্র শিল্পের মর্যাদা দেবার

পক্ষপাতী। বিংশ শতাব্দীতে এই দুই দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করলেন ট্রেভেলিয়ান (Trevelyan)। তিনি বলতে চাইলেন,—ইতিহাস রচনার প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসাতে বিজ্ঞানসম্মত নিষ্ঠা থাকবে—সে অর্থে ঐতিহাসিকও বৈজ্ঞানিক এবং ইতিহাস ও বিজ্ঞান; কিন্তু রচনাকালে রচনাপদ্ধতিতে ঐতিহাসিককে শিল্পী হয়ে উঠতে হবে। রচনার প্রসাদগুণে তখন ইতিহাস হয়ে উঠবে যথার্থ শিল্পসৃষ্টি। অতএব ইতিহাস শিল্পও বটে, বিজ্ঞানও বটে।

ট্রেভেলিয়ন নির্দিষ্ট শিল্পাদর্শ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় সম্পূর্ণ বজায় আছে। কবির সাহিত্য বিষয়ক এবং অন্যান্য প্রবন্ধের মত ইতিহাস রচনাতেও কাব্যময় ভাষা রচনার শিল্প-গৌরব বৃদ্ধি করেছে। উপমা প্রয়োগের সিদ্ধিতে 'মহাসম্রাট অশোকে'র উপরে রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ। কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে আর ব্যাখ্যাতে বৈজ্ঞানিকতা বা বস্তুনিষ্ঠার চিহ্নমাত্রও নেই। ইতিহাসের দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগের চেষ্টার মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। *'ভাবগত ইতিহাস'কে কবি 'কালগত ইতিহাস থেকে পৃথক করে দেখেছেন এবং* তার মতে সত্যের সন্ধান মেলে "ভাবগত ইতিহাস"এ' আর কেবলমাত্র তথ্যেরই সন্ধান আছে "কালগত ইতিহাসে"। কালগত ইতিহাসের 'পরে কবি বিরাগ, ভাবখানা এই যেন সত্য কালনিরপেক্ষ তথ্যনিরপেক্ষ আকাশচারী অদ্ভুত একটা কিছু। আগাগোড়া তিনি তাঁর ঐ ভাবদৃষ্টিতে চিরন্তন সত্য অন্বেষণ করেছেন, এতে আর যাই হোক ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার যে কোন মতেই হয়নি তাতে সন্দেহ নেই।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনের চেষ্টা, বিরোধের মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই হ'ল ভারতের অমর আত্মার চিরন্তন কামনা—কবির এই আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে একটা বড় প্রেরণা যুগিয়েছে। কবির ইতিহাসদৃষ্টিকেও এই আধ্যাত্মিক চেতনাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এবং তার ফলে অতীতের ভারত সেই চেতনার রঙে রঙিন হয়ে এক শিল্পমূর্তি ধারণ করেছে কবির ইতিহাস রচনায়। ভারতের ইতিহাসে কবি ঐ ঐক্যসাধনার প্রচেষ্টাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর মতে এই আবিষ্কারই হোল যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার। আর্য-অনার্য সংঘর্ষের মাঝখানে ক্ষত্রিয় জাতিই ছিল মিলনযজ্ঞের হোতা, এবং রামচন্দ্রকে কবি দেখেছেন তাদেরই একজন প্রতিনিধি রূপে। গুহক চণ্ডাল, হনুমান, সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিতালিকে এই মিলনপ্রচেষ্টারই রূপক বলে কবি মনে করেন। ব্রাহ্মণশ্রেণী ক্ষত্রিয়ের এই মিলনপ্রচেষ্টার পথে অন্তরায় ছিল, কিন্তু কবি সেজন্য তাদের 'পরে বীতরাগ নন, কেননা স্থিতি গতিকে (মিলনাকাঙ্ক্ষা) সংবরণ না করলে জীবনে অশান্তির উদ্ভব হয়। প্রথম স্তরের এই 'সামাজিক বিপ্লবে'র (আর্য-অনার্যের মিলন, ঐক্যসাধন) ইতিহাসে কবি ব্রাহ্মণ জাতিকে এই সম্পূরকের মর্যাদা দান করেছেন।

এই প্রথম স্তরের 'সামাজিক বিপ্লবের' পর এলো দ্বিতীয় পর্যায়। 'বৌদ্ধপ্রভাব বন্যায়' আমাদের সমাজের বেড়াগুলি ভেঙ্গে গেলো। উন্মুক্ত পথে বাইরের অনেক অনার্য (শক,

হুন) জাতি ভারতে প্রবেশ করল। এই নতুন সামাজিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবার কৃতিত্ব কবির মতে ব্যাসদেবের (ব্যাসদেব, রামচন্দ্র, ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা এ নিয়ে কবির কোন মাথা ব্যথা নেই)। যে জাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তার সংহতির জন্য একটি "দৃঢ় নিশ্চল কেন্দ্রের" নাকি প্রয়োজন ছিল। ব্যাসদেবের 'মহাভারত'ই কবির মতে সেই কেন্দ্রের কাজ করেছে।

এই প্রলয়কালে ক্ষত্রিয়েরা দ্রুতগতিতে অনার্যদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা ক্রমাগত নিজেদের সংহত এবং বিচ্ছিন্ন করে তুলতে লাগলেন। উত্তরকালীন রক্ষণশীলতা আর গোঁড়ামির বীজ নাকি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। সমাজশৃঙ্খলা এলো, আর্য-অনার্যে একটা বোঝাপড়াও হোলো (অনার্যের দেবতা শিব আর্যের কৌলীন্য অর্জন করলেন, শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটল) কিন্তু প্রকৃত মিলন তবুও ঘটল না।

এই নবপর্যায়ের আর্য-অনার্য বিভেদ চূড়ান্তরূপ নিল মধ্যযুগে, মুসলমান আগমনের পর। ব্রাহ্মণের মিলনবিমুখতা আর রক্ষণশীলতাই ছিল কবির মতে এর জন্য প্রধানাংশে দায়ী। এই বিরোধের মাঝখানে মিলন ঘটাবার দায়িত্ব নেবার জন্য কবির পূজা পেয়েছেন কবীর, দাদু, নানক, শ্রীচৈতন্য,—শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে আকবরের "উদার রাজনীতি।"

বিরোধের শেষ পর্যায়ে রামমোহন রায়কে কবি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনযজ্ঞের হোতা হিসাবে।

এই হল রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস দর্শনের মোটামুটি পরিচয়। ভিতরের ও বাইরের বিচিত্র সংঘাতের মধ্যেও ভারতের অবিনশ্বর আত্মা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টায় ভাস্বর,—ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথ এই অবিনশ্বর আত্মাকে আবিষ্কার করেই তৃপ্ত হয়েছেন।

কেবল মাত্র আর্য-অনার্য সংঘর্ষ আর আর্যের বিজয়ের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না—

অধিক উন্নত অস্ত্রবল, জনবল, অধিক উন্নত উৎপাদিকা শক্তির প্রসাদে অনার্যের পরে আর্যের প্রতিষ্ঠা এবং আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের ফলে জীবিকার ভিত্তিতে 'জাতিভেদ' বা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিভিন্ন শ্রেণীতে ততদিন পর্যন্তই বিশেষ কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নি, যতদিন সেকালের কৃষিপ্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সজীব ছিল। সেকালের প্রাণকেন্দ্রে যে ছিল 'কৃষি' এটুকু কবির সত্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে, রামায়ণের রূপক-বিশ্লেষণেই তার উজ্জ্বল পরিচয় আছে। জনক রাজার হলকর্ষণ যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কবি স্পষ্টভাবেই তার উল্লেখ করেছেন ;—অহল্যা পাষাণীকে প্রাণে সঞ্জীবিত করা যে অনুর্বর শস্যক্ষেত্রকে উর্বর করে তোলারই রূপক কবির তাই সুস্পষ্ট অভিমত এবং এই কাজে ক্ষত্রিয়ের কৃতিত্ব সমধিক বলে ক্ষত্রিয়ের কর্মবীর্য কবির অকুণ্ঠ সম্মান আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এ পর্যন্তই ;—কবি আর এগোতে পারেন নি। এই কৃষিপ্রধান অর্থনীতির নিশ্চলতাই (stagnation) যে পরবর্তীকালে, মধ্যযুগের ভারতের সামাজিক ও সর্বাঙ্গীন অধঃপতন

আর জড়তার মূল কারণ তা কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্যের মিলনপ্রচেষ্টার মানবতা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভিভূত করেছে, কিন্তু অচল উৎপাদিকা শক্তির জায়গায় উন্নততর অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তনেই যে ছিল সে যুগের সমস্যার প্রধান সমাধান, কেবল মানবিক ধর্মপ্রচারে নয় এ সত্য কবি উপলব্ধি করেন নি। প্রাচীনকালে কৃষির উন্নতিকল্পে ক্ষত্রিয়ের প্রচেষ্টা কবির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, আকবরের উদার রাজনীতি কবিকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান রাজশক্তির অকর্মণ্যতা (আকবরের সময়ে টোডরমল, মানসিংএর সংস্কার প্রচেষ্টা মনে রেখে একথা বলা চলে) কবির বিচারদৃষ্টি আকৃষ্ট করে নি। উগ্র জাতীয়তার দিনেও কবি ইংরেজ আগমনের কল্যাণকর দিকটুকু অনুভব করেছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র "নবভাবধারার আগমন" আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের দিকটাই কবির উদার দৃষ্টিতে একমাত্র মঙ্গলময় সত্য হয়ে দাঁড়ালো,—যন্ত্রের আগমন এবং কৃষি-অবলম্বী প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরে আঘাত হেনে এই যে প্রথম বিপ্লবের সূচনা হ'ল, সে সম্পর্কে কবি নীরব। বৈদিকযুগের কৃষিপ্রধান অর্থনীতির পরে কবির তখনও অসীম দরদ—কবির অন্যান্য প্রবন্ধ রচনায় এবং নানা শিল্পকৃতির মধ্যে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাস রচনাতে কবির উদার মানবতার পরিচয়টুকুই কেবল পেলাম, বাস্তবচেতনার লেশটুকুও তাতে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চেতনার অসঙ্গতি আর বাস্তববিমুখতা চরমে পৌঁছেছে শিখ আর মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান-পতনের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাতে। তাঁর মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল রাজত্ব একটি নগণ্য রাজনৈতিক ঘটনা, "তাহাতে রসের অভাব নাই, তাহাতে ইতিহাস জমিয়া উঠে নাই।.....ভারতবর্ষে কেবল মারাঠাজাতি ও শিখজাতির কিছুকালের ইতিহাসে যথার্থ ঐতিহাসিকতা আছে।" এই "যথার্থ ঐতিহাসিক" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি শিখ ও মারাঠা জাতির ইতিহাসের তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। নানকের ধর্মপ্রেরণাকে শিখজাতির উন্নতির একমাত্র কারণ বলে নির্দেশ করবার পর গুরুগোবিন্দের তরবারী ধারণকে অধঃপতনের কারণ বলে কবি নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শিবাজীও তরবারী ধারণ করেছিল। সেই তরবারী ধারণকে কবি পরিশোধন করে নিয়েছেন "দাক্ষিণাত্যের ধর্মগুরুদের প্রভাবে", ধর্মের বন্ধনে মারাঠাজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রচেষ্টার আদর্শটি যখন পেশোয়ারা লাঞ্ছিত করল, তখনই সুরু হোলো মারাঠা জাতির অধঃপতন—এই হোল রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা। কিন্তু ইতিহাসে মারাঠা আর শিখজাতির অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়া আর কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কি? মোগল রাজশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটুকুই হোল শিখ-মারাঠা ইতিহাসের মূলকথা, এবং মোগল ইতিহাস থেকে শিখ-মারাঠা ইতিহাসের 'পরে অযথা অধিক ঐতিহাসিক মূল্য আরোপের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ধর্মপ্রেরণা, ঐক্যসাধনের প্রেরণা, আর তাদের অভাবের মধ্যেই ঐ দুই জাতির উত্থানপতনের কারণ নিহিত নেই। রাজনৈতিক প্রেরণাটুকু উত্থানের

ইতিহাসের সঙ্গে ভালভাবেই সম্পর্কিত ; পতনের কারণ নিহিত আছে ঐ দুই জাতির নিজস্ব অর্থনৈতিক সামাজিক পরিকল্পনার অভাবের মধ্যে। ভারতের ইতিহাসের ধারায় শিখ-মারাঠা ইতিহাসের আপেক্ষিক তাৎপর্যহীনতার কারণও এর মধ্যেই নিহিত। ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধার বশে কবি এই ঘটনার 'পরে অতিরিক্ত তাৎপর্য আরোপ করেছেন।

বিশ্লেষণী শক্তি যে অপরিমিত ভাবেই ছিল তার উজ্জ্বল প্রমাণ আছে রামায়ণের অপূর্ব রূপক বিশ্লেষণে, কিন্তু এ শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটেনি। বাস্তব তথ্যকে অবলম্বন করে এ শক্তি বাস্তব সত্যের আবিষ্কার ঘটায় নি—ভাবের রাজ্যেই এ শক্তি বিলীন হয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনার এই সর্বগ্রাসিতা, abstractionএর কাছে বাস্তবচেতনার এই পরাজয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টির ক্ষেত্রে টলষ্টয়ের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না আধুনিক গান?

গৌতমকুমার সরকার—পঞ্চম বর্ষ (অর্থনীতি)

উচ্চাঙ্গ সংগীতকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তোলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে তথাকথিত আধুনিক সংগীতের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক সে বিষয়ে খানিকটা আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আগামী সংখ্যায় আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা আহ্বান করছি। —সম্পাদক

বিশুদ্ধ ভারতীয় মার্গসংগীত এবং আধুনিক লঘুসংগীতের দ্বন্দ্ব আজ সংগীতানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণ উপরোক্ত লঘুসংগীত অতি অল্পদিন হোল সংগীতের আসরে প্রবেশ করেছে ; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই তথাকথিত "আধুনিক গান" বিশুদ্ধ মার্গসংগীতকে স্থানচ্যুত করে সংগীতের ক্ষেত্রে সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্পর্ধা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছে। মার্গসংগীতের পিছনে বিরাট ঐতিহ্য থাকলেও জনপ্রিয়তার দিক থেকে লঘুসংগীত উপেক্ষণীয় নয় এবং এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।

এই তথাকথিত লঘুসংগীতের পৃষ্ঠপোষকদের মতামতটা বিচার করা প্রয়োজন। এঁদের মতে ভারতীয় মার্গসংগীত একটি সুপ্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় শিল্পকলা ব্যতীত কিছুই নয় এবং এর আবেদন কেবলমাত্র এক শ্রেণীর সংগীতবেত্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই একে আমাদের সংস্কৃতির যাদুঘরে তুলে রাখলেই এর প্রতি সুবিচার করা হবে। তাঁরা আরো বলেন যে মার্গসংগীতের ভিতরে যে সম্ভাবনা ছিল তা যুগব্যাপী অনুশীলনের ফলে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং এখন এর মধ্যে নূতন সৃষ্টির উপাদান কিছু নেই। যেমন একজন বলেছেন—"Indian

classical music represents a slavish conformity to tradition and has ceased to be a creative art", কিন্তু এই মতবাদ অযৌক্তিক। যে কোন সংগীত এবং বিশেষ করে মার্গসংগীতের ক্ষেত্রে যে শিল্পী নিত্যনূতন রসসৃষ্টিতে অপারগ তাঁকে সার্থকশিল্পীর পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। মাত্র কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় সংগীতের সার্থকতম শিল্পী আবদুল করিম খাঁ যখন এক সম্পূর্ণ অভিনব রাগ অনুশীলন পদ্ধতির ("ঘরানা") প্রচলন ক'রেছিলেন, তখন গোঁড়া মার্গসংগীতবেত্তাদের আসরে তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। রজব আলী খাঁর মত শিল্পীও (যিনি গতবারে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেছেন) তাঁর বিরোধিতা করতে বিমুখ হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রগতির কাছে সংস্কারকে মাথা নত করতে হয়েছে—খাঁ সাহেবের ঘরানা আজ মার্গসংগীত-সমাজে পরম সমারোহে সমাদৃত হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় মার্গসংগীতকে অগ্রগতির পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা সত্যের অপলাপ করেছেন। পণ্ডিত রবিশংকর এবং আলি আকবর খাঁ (মাইহারের বাঙ্গালী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁয়ের সার্থক শিষ্যদ্বয়) বহু নূতন মিশ্র রাগের প্রচলন করে ভারতীয় সংগীতের অন্তর্নিহিত বিপুল সম্ভাবনার প্রতি ইংগিত করেছেন। আবার বহু প্রচলিত রাগকেও বিচিত্র কলাকৌশলে রূপায়িত করে তাঁরা মার্গসংগীতকে নবকলেবর দান করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটক সংগীতের ক্ষেত্রে ভেংকটস্বামী নাইডুও আমাদের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সন্ধান দিয়েছেন। আর (বড়ে) গোলাম আলি খান তাঁর অপূর্ব্ব সংগীতপ্রতিভার যাদুস্পর্শে নিত্য নূতন সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে আমাদের অভিভূত করে দিয়েছেন। এঁদের সৃজনীপ্রতিভা ভারতীয় মার্গসংগীতের পরিধিকে দিগন্তপ্রসারী করে তুলেছে।

মার্গসংগীতের বিরুদ্ধে অপর যে একটি অভিযোগ করা হয়েছে তা হোল এর দুর্বোধ্যতা! বিরুদ্ধবাদীদের মতে এই কারণেই উচ্চাঙ্গসংগীতও সর্বজন সমাদৃত হতে পারেনি এবং সাধারণ জনসমাজ তাকে বর্জন করে লঘুসংগীতকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু দুর্বোধ্যতার নজির দেখিয়ে যাঁরা বলতে চান যে মার্গসংগীত লঘুসংগীতের জনপ্রিয়তার কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে তাঁদের অভিমতকে একবার ভাল করে যাচাই করে নেওয়া দরকার। বিরুদ্ধবাদীরা শুনলে হতবাক্ হবেন যে সমগ্র ভারতে মার্গসংগীত, লঘুসংগীতের চেয়ে কম জনপ্রিয়তার দাবী রাখে না। দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রের সংগীতগুলিতেও উচ্চাঙ্গের সুরসংযোগ দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের সংগীতসভাগুলিতে লঘুসংগীত কোনদিন স্থান পায়নি। আর এও ঠিক যে উত্তর ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই মার্গসংগীতের পক্ষপাতী। সমগ্র ভারতের সংগীতরসিকদের মতামত যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে মার্গসংগীতানুরাগীদের সংখ্যা যে লঘুসংগীতের পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাকে অতিক্রম করবে—এ ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। বস্তুতঃ বিরুদ্ধবাদীরা মার্গ-সংগীতের বিরুদ্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ অনুমোদন যোগ্য নয়। যদি তালের এবং লয়ের কারুকার্যকে দুর্বোধ্য আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে Rhumba, Sumba,

Tango প্রভৃতি দুরূহ পাশ্চাত্ত্য সংগীতগুলিকে আমরা কি করে গ্রহণ করতে পারি? চলচ্চিত্রের আধুনিক গানগুলি শুনে যাঁরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন তাঁদের ক'জন একটি Rhumba এবং Tango অথবা একটি Diagonal Waltz এবং Viennese Waltz-এর প্রভেদ উপলব্ধি ক'রতে পারেন? যদি পাশ্চাত্ত্য ছন্দপদ্ধতিগুলিকে বিশুদ্ধ কলাসম্মত ভাবে গ্রহণ করা হোত তাহ'লে সেগুলি অতি শুদ্ধ এবং অভিজাত ভারতীয় মার্গসংগীতের চেয়েও কম জটিল হত না। তাই আজকাল চলচ্চিত্রের গানগুলিতে পাশ্চাত্ত্য এবং ভারতীয় সুরের এক বিচিত্র সংমিশ্রণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। অবিমিশ্র পাশ্চাত্ত্য গীতরসের মহিমায় নয় ভারতীয় সুরের স্পর্শ আছে বলেই সেগুলি আজ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর মার্গসংগীতের আকর্ষণীয়তাকে বর্দ্ধিত করেছে ঠুংরী এবং গজল গান। এদের কোনমতেই লঘুসংগীত বলে আখ্যাত করা চলতে পারে না। প্রায় প্রত্যেক উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীই খেয়াল অথবা ধ্রুপদ অথবা টপ্পা বা ঘরানা গানের শেষে একখানি ঠুংরী অথবা গজল বা ধুন গেয়ে থাকেন। প্রথমোক্ত গানগুলির গাম্ভীর্যময় পরিবেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর গানগুলি শ্রোতাদের শুধু পরিতৃপ্ত করে না, মার্গসংগীতের বিচিত্র রস উপলব্ধিতে সহায়তা করে। অনেকে ভজন গানকে লঘুসংগীতের অন্তর্ভুক্ত ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। এতে বলবার কিছু নেই। কারণ ভজন গান সংগীতের কোন বিশেষ শ্রেণী নয়। যে কোন ধর্মমূলক রচনাকেই ভজন আখ্যা দেওয়া যায়। তবে কবীর, সুরদাস এবং বিশেষ ক'রে মীরার ভজনগুলি যে সুরের আভিজাত্যে মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে তা অনস্বীকার্য।

সুতরাং মার্গসংগীতের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয়েছে সগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। তবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যথার্থ রসোপলব্ধির জন্যে শ্রোতারও যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। আর শিল্পী হবেন যথার্থ স্রষ্টা। যে উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী চিরাচরিত প্রথাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকেন তিনি সার্থকতার গৌরব থেকে বঞ্চিত। সার্থক শিল্পী সৃষ্টির উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে হিন্দু রাগরাগিণীর পটভূমিকায় মনোবিহারের এক একটি বিচিত্র রাজপথ নির্মাণ ক'রবেন। মূলরাগকে পরিবর্তিত করা চলবে না, কিন্তু প্রত্যেকটি রাগই শিল্পীর প্রকাশকৌশলে এক এক অপরূপ জ্যোৎস্নাস্নাত সুষমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় রাগরাগিণীর সঙ্গে লোকগীতির এক অনবদ্য সংমিশ্রণ করে সার্থক শিল্পীর মহিমায় পরিমণ্ডিত হ'য়েছেন। তিনি সংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন। মার্গসংগীতের বিপুল সম্পদের মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তার সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা নিত্য নূতন সুর সৃষ্টি করতে পারি। লঘু সংগীতের পরিমিত পরিসর অতিক্রান্ত হ'য়ে মার্গসংগীতের আশ্রয় নিলেই ভারতীয় সংগীত কলার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

একজন সমালোচকের মতে "they will yield a far richer crop in all varieties of music than an unimaginative grafting of western music-hall tunes of the last decade."

আনন্দের কথা, প্রকৃত কলাবিদ্‌রা আজ উচ্চাঙ্গ সংগীতের সর্ব্বাঙ্গীন উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। শিল্পী আলি আকবর চলচ্চিত্রের সংগীতকে উচ্চাংগ সংগীতের রসোত্তীর্ণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কয়েকটি আধুনিক চলচ্চিত্রের রাগপ্রধান সংগীতগুলি জনসাধারণের মনোহরণ ক'রেছে এবং তার ফলে আধুনিক গানের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে। বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যে বেতার যন্ত্র বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সংগীতকে রাজদরবারের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে সাধারণের মধ্যে বিতরণ ক'রছে। আর জাতীয় সরকার নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে জনচিত্তকে মার্গসংগীতাভিমুখী করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এর থেকেই আমরা মার্গসংগীতের সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে তার পরিপূর্ণ আভাস পাচ্ছি। সংগীতের আসরে লঘু সংগীতের অতর্কিত পদসঞ্চার একটা সাময়িক মোহের সৃষ্টি ক'রলেও আমাদের মোহমুক্তির যুগ সুরু হ'য়েছে। সভ্যতার আদিকাল থেকে যে ভারতীয় মার্গসংগীতের মন্দাকিনী ধারা রসিকজনচিত্তকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিল আজকের দারিদ্র্যনিপীড়িত জীবনের চরম হতাশার মধ্যেও ভারতবাসী সেই মার্গসংগীতকে নিষ্ঠার সংগে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস পেয়েছে। এর পিছনে রয়েছে শুধু ভারতীয় চিত্তের সহজাত শিল্পানুরাগ নয়, মার্গসংগীতের শাশ্বত আবেদন। লঘুসংগীতের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী—রূপরসগন্ধের একটা স্নায়বিক sensation এই যার পরিসমাপ্তি। কিন্তু মার্গসংগীত আমাদের দিয়েছে অধ্যাত্মরসের আস্বাদ। তাই যুগে যুগে আমরা ভারতীয় সংগীত শিল্পীদের ভগবৎসাধক রূপে দেখতে পেয়েছি।

আমাদের কথা

ছাত্র-পরিষদ :

আমাদের কাজ সারা হয়ে গেছে। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কাজের তালিকা তৈরীটাই বাকি ছিল। আপাতত একটা নিয়ম মাফিক সংক্ষিপ্ত তালিকা দিচ্ছি।

অবশ্য সংক্ষিপ্ত করবার কোন প্রশ্ন ওঠে না, কারণ কাজের সংখ্যাল্পতার জন্য তালিকা আপনিই ছোট হবে। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও কাজগুলি গুণে সমৃদ্ধ ছিল কিনা সেটাও বিচার্য। বিচারের ভার রইল ছাত্র-ছাত্রীদের 'পরেই।

বিতর্ক পরিষদ :

বিতর্ক পরিষদের পক্ষ থেকে মোট চারটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তার মধ্যে "Religious Education,"

"এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা সভার কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীসুবিমল মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ অতীন বসু। এজন্য তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়; ব্যক্তিগতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন মেডিক্যাল কলেজের অভিজিৎ বসু এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের J. Oder Jew। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের কলেজ এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি।

এ ছাড়া একটি আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিলো। বিতর্কের বিষয় ছিল "Peaceful co-existence of communism and capitalism is possible"। এ সভায় বিচারের ভার ছিল ডাঃ অমলেশ ত্রিপাঠী এবং অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্যের ওপর। এঁদের কাছে সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। জয়লাভ হয়েছিল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর; ২য় বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীকমল দত্ত এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হন।

এ ছাড়াও দুটি সাধারণ বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয় ছিল "Technical education divorced entirely from general education is imperfect" এবং "Circumstances and not individuals mould history." যে সব ছাত্ররা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবকটি সভাতেই সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বিভাগীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার। তাঁর মূল্যবান উপদেশ আমাদের অনুষ্ঠানগুলিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দ্বিতীয় সভাটিতে, বিশেষ কারণে অধ্যাপক মজুমদারকে কাজ শেষ হবার আগেই চলে যেতে হয়েছিলো। বাকী সময়ে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। তাঁকেও আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্পাদক—শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র পরিষদ :

সংখ্যাল্পতায় রবীন্দ্র পরিষদের অনুষ্ঠান আমাদের কলেজে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এই অল্পতাকে বহুত্বে পরিণত করাটা যে ছাত্রদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা সাপেক্ষ একথা বারবার বলা হয়েছে। হয়তো অভ্যাসের বশেই, আমি আরেকবার বলছি।

সংখ্যায় অল্প হলেও, আয়োজিত অনুষ্ঠান দুটি সত্যই উচ্চশ্রেণীর হয়েছিলো। প্রথমে কবিগুরুর ঋতু সংগীতের একটি আসরের আয়োজন করা হয়েছিলো। গ্রন্থনার ভার ছিল অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্যের 'পরে। নিমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। সে জন্যে আমরা দুঃখিত। তবে দেবব্রতবিশ্বাস, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, অমিত মিত্র এবং তপতী দাসের সুগীত সংগীতে উৎসব সম্পূর্ণ সার্থক হতে পেরেছিলো।

আমাদের দ্বিতীয় এবং শেষ আয়োজন হয়েছিল 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের। বিভিন্ন শিল্পী সমাগমে এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহণে সে অনুষ্ঠান হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিলো। অংশ গ্রহণ করেছিলেন—সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, আল্‌পনা রায় এবং কলেজের জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য, যশোধরা সেনগুপ্তা, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়, হেনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা গুহ, অলকানন্দা দাশগুপ্তা, নন্দিতা দত্ত, কুণাল বাগচী। সুচিত্রা মিত্র এবং দেবব্রত বিশ্বাসের গান অপূর্ব সুন্দর হয়েছিলো। ছাত্রছাত্রীদের গানও বেশ ভাল হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। সংলাপ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কলেজের ছাত্র শিশির দাস। সংলাপ পাঠ করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীশম্ভু মিত্র।

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ আমাদের কাজকে সুশৃঙ্খল করে তুলেছে। সেজন্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সম্পাদক—অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়ম মাফিক কর্মতালিকা পেশ করা শেষ হোল। এবার নিয়মমাফিক ধন্যবাদ দেবার পালা। যারা নানাভাবে আমাদের কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে একযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নবনির্বাচিত ছাত্রপরিষদের হাতে কার্যভার তুলে দিয়ে এবং নূতন পরিষদের কাজের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা কামনা করে আমরা এবার বিদায় নিচ্ছি।

সাধাধণ সম্পাদক—শ্রীজ্যোতির্ময় পালচৌধুরী

এথ্‌লেটিক ক্লাব :

কলেজ পত্রিকার শেষ সংখ্যায় গত হকি সীজনের গোড়া পর্যন্ত এই বিভাগের খবর বেরিয়েছিল। হকি মরশুমের প্রথম ৪।৫টি খেলা দেখে যে আশা হয়েছিল, সেটা বেশীদিন রইল না। তাও আন্তঃকলেজ লীগে আমরা আমাদের গ্রুপে ৪র্থ স্থান অধিকার করি। আন্তঃকলেজ নক-আউট প্রতিযোগিতায় বি. ই. কলেজের বিরুদ্ধে আমাদের ১ম রাউণ্ডের খেলা খুবই ভাল হয়। বি. ই. কলেজের মত দলের বিরুদ্ধে আমরা প্রথমেই একটী গোল করে সারাক্ষণ তাদের "চেপে রেখে দিয়েছিলাম"—শেষ মুহূর্তে খেলাটি ড্র হয়ে গেল। আমরা পুনরনুষ্ঠিত খেলায় হেরে যাই। সেদিন আমাদের অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়দের মনোভাব দেখে কষ্ট পেলাম—তারা সকলে যেন 'হারব' এই ঠিক করেই মাঠে নামলেন।...কলেজের পরীক্ষার জন্য হকি সীজন্ যেন কিছুটা হঠাৎ-ই শেষ হয়ে গেল।

এই তো গেল হকির কথা। আমাদের 'বার্ষিক হিসেব নিকেষের সভাটিও' অধ্যক্ষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিপুল উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিভাগীয় এবং সাধারণ সম্পাদক তাঁদের বাৎসরিক

রিপোর্ট পড়ার পর শ্রীশৈবাল সেন প্রস্তাব করেন যে, 'ভাদুড়ী'-র গত বছরের কৃতিত্বপূর্ণ সেঞ্চুরীর জন্য তাঁকে কলেজ থেকে 'সুভেনির্' হিসেবে একটি নূতন ম্যাচ-ব্যাট দেওয়া হউক। প্রস্তাবটি প্রচুর হাততালি আর টেবিল চাপড়ানির মধ্যে সমস্ত সভা কর্তৃক সমর্থিত এবং গৃহীত হ'ল। ছাত্রী বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীনন্দিতা দত্তের ছাত্রীদের খেলার মাঠ 'ঘিরে দেবার' জন্য দাবীও এই সভায় সমর্থিত ও গৃহীত হয়। গত বছরের বাজেটে যে টাকা বেঁচেছে, তা থেকে এ সকল উপরি খরচা হবে এবং উদ্বৃত্ত টাকা আমাদের মাঠ-উন্নয়নে ব্যয় করা হবে;

এই সভাতেই ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য শ্রীপ্রবীর বোস ফুটবল বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এবারকার ফুটবল সীজন আমাদের কলেজে পূজোর ছুটির বেশ কিছু আগেই শেষ হয়ে গেল। আমাদের দলের এবার অধিনায়ক ছিলেন শ্রীঅসীমকুমার সরকার। আন্তঃকলেজ লীগে আমরা ভাল করতে পারিনি। 'নক্-আউট' প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে হেরম্ব মৈত্র শীল্ডে আমরা নরসিংহ দত্ত কলেজকে ১ম রাউণ্ডে 'রি-প্লে ম্যাচে' ২-০ গোলে হারিয়ে ২য় রাউণ্ডে উঠি; কিন্তু সিটি কলেজের কাছে এই পর্যায়ের খেলায় হেরে যাই। Hardinge Birthday Shield-এ আমরা নিশ্চিত দুর্ভাগ্যবশতঃ মেডিক্যাল কলেজের কাছে হেরে যাই (১-২ গোলে)। ইলিয়ট শীল্ডে এবার প্রত্যেক কলেজকে 'Full booted-team' নাবাতে হয়; এতে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হয়েছিল। কেননা আমাদের নিয়মিত খেলোয়াড়দের অনেকের-ই 'বুট' নেই, কলেজ থেকে মাত্র তিন জোড়া বুট এবার দেওয়া হয়। জোড়া তালি দিয়ে আমাদেরও Booted-team হ'ল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে সে দল (০-২) গোলে হেরে গেল। আশা করছি আসছে বছর কলেজ থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে বুট্ দেওয়া হবে এবং বুটের অভাবে আমাদের এ দুরবস্থা আর হবে না।

আন্তঃশ্রেণী প্রতিযোগিতাগুলি যথারীতি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। লীগে P. C. চ্যাম্পিয়ান হয়। Principal B. M. Sen Challenge Cup, ২য় বর্ষ তাদের উন্নততর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের সাহায্যে ফাইনালে ৪র্থ বর্ষকে হারিয়ে লাভ করে।

তৃতীয় বর্ষও নিজেদের মধ্যে কয়েকটি 'Inter-Departmental' ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করে!

এবার ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে কলেজের এই বিভাগ একটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর উৎসাহ সত্ত্বেও বৃষ্টির জন্য তাঁদের স্পোর্টস্ বাদ দিতে হ'ল। কিন্তু Festival ফুটবল (Captain's XI Vs. Secretary's XI) ঐদিন বেশ জমেছিল—খেলাটি ড্র হয়।

নূতন ১ম বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ কলেজে যোগ দেওয়ার অল্প পরেই নূতন কমিটি, ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য গঠিত হয়। শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে নতুন কমিটির প্রথম সভা হয়। এই সভাতে সাধারণ সম্পাদক এবং বিভিন্নবিভাগীয় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়। এই সভাতেই আমি নতুন সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅসীম কুমার ভট্টাচার্য্যের হাতে আমার সমস্ত কাজের দায়িত্ব তুলে দিলাম।

কলেজের ছাত্রীরাও ছাত্রীবিভাগের সম্পাদিকা নির্ব্বাচনের জন্য ননীগোপাল বাবুর সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হন। ছাত্রীদের জন্য নির্ব্বচনী সভার প্রয়োজন এথ্লেটিক ক্লাবের ইতিহাসে এই প্রথম। তিন জন প্রার্থীর মধ্যে শ্রীনবনীতা দেব নির্বাচিতা হ'ন। ছাত্রীদের মধ্যে এই উৎসাহ দেখে আশা করা যায় তাঁদের বিভাগের কাজ অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার কিছু ভাল হবে।

শ্রীঅসীমকুমারের পরিচালনায় আমি নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করি। আমি আবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের সকলের নাম মনে করছি, যাঁদের কাছ থেকে আমি আমার নানা কাজে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি।

সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়া বিভাগ—সুনয় সানাতানি

সমাজ সেবা-বিভাগ

এ বৎসরে আমাদের প্রধান প্রধান কাজ হলো :

১। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে যাদবপুরে তিনটি কলোনীর (বাপুজীনগর, রামকৃষ্ণপুর ও আনন্দপুর) দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ (উঠেছিল, ১২৭৲ টাকা, ব্যয় হয়েছে ১২৬।০ আনা)

২। ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগে এই কলেজের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থালয় (Text-Book Library) প্রতিষ্ঠা।

৩। উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যায় (১৯৫৪) সাহায্য (সংগৃহীত) ২৯৯/০ আনা। "

অন্যান্য কাজ :

এই কলেজের চতুর্থ বার্ষিক বিজ্ঞান (১৯৫৩) শ্রেণীর এক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফি ও অপর একটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্রকে পুনর্ভর্ত্তীর অর্থ যোগান, ৮।৯টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে পড়াশুনোর জন্য ও ৩টি রোগীকে ঔষধ ও পথ্যের জন্য অর্থ সাহায্য ও বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ দুঃস্থ ভদ্রলোক ও বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে অর্থ সাহায্য করন।

সম্পাদক, সোসাল সার্ভিস লীগ—সঞ্জীবচন্দ্র সরকার

জুনিয়র কমনরুম :

বৎসরান্তে কমনরুমের কার্য্যাবলীর বিবরণ দেওয়ার আগে আমি প্রফেসর মামুদ ও অধ্যক্ষ জে, সি, সেনগুপ্তকে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারের সভাপতিত্বে Table Tennis Competitionএর পুরস্কার বিতরণী সভাটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহে কোন ত্রুটি ঘটেনি। স্বল্প-পরিসর কমনরুমে ইচ্ছা থাকলেও আর নতুন Table আনা সম্ভব হয়নি। ম্যাগাজিন ও খবরের কাগজের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সেস্‌নের প্রথমদিকে কমনরুমের ভীড়ে প্রাণান্ত হয়ে উঠে, যাতে করে কমনরুমের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করে এজন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নতুন সম্পাদক মণ্ডলীর উপর কার্যভার তুলে দিয়ে আর সমসাময়িক ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের অভিনন্দন জানিয়ে এবার বিদায় নিচ্ছি।

সম্পাদক—শ্রীপঙ্কজ রায়

অর্থনীতি সেমিনার :

কলেজ ম্যাগাজিনের গত সংখ্যা এবং এই সংখ্যা প্রকাশের মাঝে আমরা বেশ কতগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছি। জুলাই মাসের শেষের দিকে আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক ছাত্র প্রতিনিধি দলকে এক সম্বর্ধনা সভায় আপ্যায়িত করি। এর পরে আমাদের উল্লেখযোগ্য কাজ হোল, অর্থনীতির পুরোণো এবং নতুন ছাত্রদের সম্মেলন। ১৯০৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত এই ক'বছরের ছাত্রদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আর্টস্ লাইব্রেরী হলে। সকলের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। সভার প্রারম্ভে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ঘোষাল তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। এর পরে প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডাঃ জে, পি, নিয়োগী ও শ্রীশৈবাল গুপ্ত বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান ছাত্রদের তরফ থেকে শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী

বক্তৃতা করেন। সভায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতির প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের নিয়ে একটি Presideney College Economics Students' Association. গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এবার আমাদের সেমিনারের উদ্যোগে কয়েকটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। জোতিষের লেখা 'Industrial Finance tn India' এবং শান্তির লেখা 'Problem of Development of Underdev. Countries' দুটি প্রবন্ধ দুদিন প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে পঠিত ও আলোচিত হয়। এছাড়া, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে একদিন মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন সুবিখ্যাত ডাঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জি।

সেমিনারের নানা কাজে অনেকের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। বিশেষ করে Rc-Unionএর কাজে অধ্যাপক ঘোষালের উৎসাহ, অধ্যাপক মজুমদারের সাহায্য এবং ছাত্রবন্ধুদের সমবেত সহযোগিতা অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলেছিল।

সেমিনারের অন্যান্য কাজে আমি অধ্যাপক ঘোষাল, অধ্যাপক ঘোষ, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক মজুমদারের কাছ থেকে বহু সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সকলকে এবং ছাত্রবন্ধুদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ব্যক্তিগত ভাবে সকলের নামোল্লেখ সম্ভাব্যতার বাইরে তাই তা থেকে বিরত রইলাম।

আশাকরি অর্থনীতি সেমিনারের গৌরব আমরা এই বছর উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছি।

সম্পাদক—প্রদীপরঞ্জন সর্ব্বাধিকারি

ইতিহাস সেমিনার :

অন্যান্য বছরের সম্পাদকের মতো আমরাও অনেক কিছু করবার আশা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও আশা পূর্ণ হয় নি। কেন কাজ মনোমত হল না তার কারণ দেখানোর প্রয়োজন নেই তবে একটা কথা বোধহয় বলা উচিত। ছাত্রবন্ধুদের উৎসাহ যদি আর একটু বেশী থাকতো, আমাদের কাজ তবে নিশ্চয়ই আরও একটু বেশী হ'ত।

বর্ত্তমান চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে লেখকের অভাব আমরা খুব বেশী বোধ করেছি। বিস্ময়ের কথা, দুঃখেরও বটে, সারা বছরে একটা অধিবেশন বসল না।

আবরা কেবল বিদায়সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানই করেছি—আর ছেলেদের বই দিয়েছি। সুখের কথা, এবারে সেমিনারে আমরা কিছু নূতন বই পেয়েছি।

আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে বদলী হ'য়ে গিয়েছেন। পরিবর্ত্তে এসেছেন শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী।

আমাদের মাননীয় বিদায়ী অধ্যাপকের বিদায় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছি।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকারকে তাঁর মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক—শ্রীঅবনী বিশ্বাস

রাজনীতি সেমিনার :

সেমিনারের সম্পাদক হিসাবে যে কার্যভার নিয়েছিলাম তা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বই দেওয়া নেওয়ার কাজ ছাড়াও এবারে আমাদের বেশ কয়েকটা Seminar-meeting হয়েছে। তারমধ্যে সহপাঠী শ্রীঅমিয় বাগচী-পঠিত—'On Principles of Equality' আর শ্রীঅমল দত্তের 'Liberty and Equality'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। গত আগষ্ট মাসে আমরা আমাদের বিভাগের সর্বপ্রথম Re-union বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন করি। এ ব্যাপারে আমরা প্রাক্তন ছাত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করি। সহকর্মী

প্রদীপ ছাড়া সহপাঠী শ্রীঅসিত ব্যানার্জী আর রূপেন ব্যানার্জী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে আমাদের উৎসবটিকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

সর্বশেষে প্রোফেসর ঘোষাল এবং প্রোফেসর তাপস মজুমদারকে তাঁদের মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এইখানেই ইতি করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রণবকুমার চ্যাটার্জী

দর্শন সেমিনার :

রিপোর্ট লিখতে গিয়ে ভাবছি আমাদের কাজে আমরা কতদূর এগিয়েছি। এখনও অনেক কাজ আমাদের যত্ন অপেক্ষা করছে।

সেমিনারে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের জন্য আবেদন করেও আজ পর্যন্ত কোন ফল হয় নি।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এবার সেমিনারের আধ্যায়নিক কার্যক্রমের দিকে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি। গরমের ছুটির পর আমাদের মোট চারটে কার্যক্রম হয়।

প্রথমতঃ, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীমতী জয়শ্রী সেনগুপ্তা তাঁর "Solipsism of Descartes" প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ'র উপর দু'দিন জোর আলোচনা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তবিভাগীয় গবেষণাকারক কৃতী ছাত্র শ্রীসীতানাথ গোস্বামী "Vedanta and Hinduism" সম্বন্ধে এক সুযোগ্য ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন। আগ্রহশীল অনেক ছাত্র-ছাত্রী সেদিনকার কার্যক্রমে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর শ্রীঅজিত কুমার ভাদুড়ী "Sankara and Spinoza" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শেষ কার্যক্রম হচ্ছে শ্রীমতী সীতা সেনের "Immorality and Suicide" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। পূর্বোক্ত সমস্ত কার্যক্রমেই সেমিনারের সভাপতি শ্রদ্ধেয় ডাঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। সেমিনারে বইয়ের সংখ্যা বাড়ান হ'য়েছে। বই দেবার কাজ রীতিমত চলেছে। প্রাচীর পত্র বের করবার জন্য উপযুক্ত অর্থ আমাদের সংগ্রহ হ'য়ে গে'ছে। পূজোর ছুটির পরই প্রাচীর পত্র বের হ'বে আমরা আশা করছি।

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য সহঃ সম্পাদক—শ্রীজয়ন্তকুমার ঘোষ

পদার্থবিদ্যা সেমিনার :

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রত্যেকটি বিভাগের সেমিনারে ছাত্রছাত্রীরা নানা জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্কের আয়োজন করে থাকেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা বিভাগে এ পর্য্যন্ত কোনও রকম সুসমঞ্জস প্রচেষ্টা হয়েছে বলে জানা নেই। তবে আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তীরা এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁরাই আমাদের প্রচেষ্টার প্রেরণা যুগিয়েছেন।

আমাদের সেমিনারে আলোচনার ধারাটা একটু অন্য রকমের। সাধারণতঃ কলেজে পাঠ্য কোনও বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হয় না। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে যে সব কৌতূহলী ও চমকপ্রদ আবিষ্কার ও জ্ঞান সংগৃহীত হয়েছে তাদেরই উপর অত্যন্ত সাধারণ স্তরে আলোচনা হয়ে থাকে যাতে সবারই বোঝবার সুবিধা হয়। এই হিসাবে আমাদের সেমিনার নূতনত্ব দাবী করতে পারে।

"Ionosphere" এর উপর বর্ত্তমান চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শ্রীমান উৎপল ব্যানার্জ্জির আলোচনা নিয়েই এবারকার সেমিনার আরম্ভ হয়। এ ছাড়া অসিত গোস্বামী, নিত্যনাথ ইত্যাদি ছাত্রগণ অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে

বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলি হচ্ছে 'Entropy' 'Cosmology', 'Black body radiation' ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের আলোচনাই আমাদের ভাল লেগেছে।

উপসংহারে আর একটি না বললে ভুল হবে। বর্ত্তমান পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদিলীপ ভদ্রের কাছে আমরা অনেক বিষয়েই ঋণী। 'কোয়ান্টম পরিমিতিবাদ', 'ষ্ট্যাটিষ্টিকাল থার্মোডাইনামিক্স' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাগুলি সত্যিই রসগ্রাহী হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরনার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

যাই হোক আমরা আশা করি আমাদের পরবর্ত্তী ছাত্রবন্ধুগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাকেই আরও বৃহত্তর সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবেন। সবশেষে যে সব ছাত্রবন্ধুর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি তাদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্পাদক 'পদার্থবিদ্যা সেমিনার'—শ্রীগৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী

Botany Seminar :

বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিভাগের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজের ইতিহাস নেই। Dr. J. N. Mukherjeeর সভাপতিত্বে কিছুদিন আগে Bengal Botanical Societyর যে বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল আমাদের কলেজে, তাতে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে Societyএর তরফ থেকে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছে, Society সম্পাদক ডাঃ রায়ের আমন্ত্রণে আমরা সেদিন 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরের' বিভিন্ন বিভাগ দেখে এলাম। Cytological এবং Physiological কাজগুলো খুবই ভাল লাগলো। আর তার চাইতে ভাল লাগলো ডাঃ রায়ের মিষ্টি ব্যবহার।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে Colloquiumএর ব্যাপারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত উদাসীন। এবার Colloquium-সম্পাদক বন্ধুবর কল্যাণ দত্তের তরফ থেকে বিশেষ প্রশংসনীয় সারা পাওয়া গেছে। এবার আলোচনা সভায় নিচের কয়টি বিষয় আলোচিত হয়েছে—

1. "The modern Concept of Gene"—Sri C. R. Das.

2. "The anxin Content of the Crop Plant in relation to the external factors"—Dr. T. Das.

3. "Indian weeds and how to control them"—Sri S. Dutta.

4. "Antagonism and Production of antibiotics"—Sri C. R. Das.

5. "Application of Radio isotopes in the investigation of plant processes"—Sri R. Mukherjee.

6. Chromatography in plant research"—Dr. S. Sen.

উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে ডাঃ তারক দাস এবং ডাঃ শ্যামাপদ সেন-এর বিষয় দুটি অত্যন্ত সহজ, রসাল এবং উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। এঁরা দুজনই সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত। বলার শ্রম স্বীকারের জন্য এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বলতে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি যে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ বছর সুভাষ দত্ত এবং সুমিত্রা তালুকদার উচ্চশিক্ষা পাবার জন্য সরকারী বৃত্তিতে বিদেশ যাত্রা করেছেন। যাত্রা এঁদের সার্থক হোক, এই কামনাই করি।

সম্পাদক—শ্যামাপদ সাহা

গণিত সেমিনার :

কাজের ভার পেয়েছি বেশীদিন হয়নি, কিন্তু এর মধ্যে বই লেন দেনের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। সেমিনারে প্রয়োজনের তুলনায় বই সংখ্যা অত্যল্প। তাই সেমিনারের সভ্যদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে বইর সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টায় আছি। আশা করি তাঁরা এই চেষ্টায় আন্তরিক সাড়া দেবেন, আমরা এর জন্য কর্তৃপক্ষকেও একটু দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এর মধ্যে আমাদের কয়েকটি অধিবেশন হয়ে গেল। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলী কতকগুলি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

কিছুদিন হলো অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ বসু এসেছেন আমাদের বিভাগে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ থেকে—আমরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

সেমিনারের কাজে সব সময়ই সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করি ভবিষ্যতেও তাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবো না। আর আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই প্রফেসর কামিনীকুমার দে'কে—তাঁর অদম্য প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে আমরা উপকৃত হয়েছি।

সবশেষে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাক্তন সম্পাদক সুনীল পালকে।

সম্পাদক—সুনীল ভৌমিক

গার্লস কমনরুম :

এবারকার রিপোর্ট দিতে গিয়ে প্রথমেই আনন্দের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ দুর হয়েছে—অর্থাৎ গার্লস কমনরুম বড় করা হয়েছে। এতদিন যা ছিল পরিকল্পনা আজ তা কার্যে পরিণত করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। খাবার ও পানীয় যথারীতি পাওয়া যাচ্ছে সেদিক দিয়ে কোন অসুবিধে নেই। তবে কমনরুম আয়তনে বাড়ানোর দরুণ একখানা টেবিল ও খানকয়েক চেয়ারের প্রয়োজন অনুভব করছি। এ দাবীটা আশা করি শীগ্‌গিরই পুরণ হবে। Indoor Gamesএর বন্দোবস্ত আমি করতে পারলাম না, নানারকম অসুবিধের জন্য। আশা করি আমার পরবর্ত্তীজন এ ব্যবস্থাটা করতে পারবেন।

সেক্রেটারী—সুফিয়া চৌধুরী

লন টেনিস :

খেলাটির আভিজাত্য আছে। সবদেশেই এর চলন। আদরও কম না। বন্ধুরা বুঝতে চান না।

গত বছর অনেক চেষ্টা করেও ন'জনের বেশী সদস্য যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ফলে লন টেনিস বিভাগটি বন্ধই থেকে যায়। কমপক্ষে ডজন খানেক সদস্য চাই। এ বছর সওয়া ডজন হয়েছে। খেলা চলার পক্ষে যথেষ্ট। আশা করছি নিয়মিত খেলা হবে। ভাগ্যিস্ আশা Pandoraর বাক্সে বন্দিনী।

যে সব বন্ধুরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের ধন্যবাদ।

সেক্রেটারী—এম. কে. খীশা প্রেসিডেন্সি কলেজ এথলেটিক ক্লাব

ভূজ্ঞান পরিষদ :

আমাদের পরিষদের এ বছরের নূতন কার্য্যের উদ্বোধন হয় ১৫ই আগষ্টের "পরিক্রমা" প্রাচীর পত্রিকার প্রকাশনীর মধ্য দিয়ে। তারপরে ১৮ই আগষ্ট তারিখে, আমরা সকলে একটা প্রাথমিক কার্যকরী সমিতির সভায়

মিলিত হই। সেখানে ১৯৫৪-৫৫ সালের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। এর ঠিক একমাস পরে অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করি। পরের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো "রঙীন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর" ব্যবস্থা করা। ২৩শে, সেপ্টেম্বর বৈকাল ৪টার সময় আমাদের গত জুন মাসের কাশ্মীর ভ্রমণের উপর সম্পূর্ণ একটি রঙীন চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক এস, সি, দাসগুপ্ত কাশ্মীরে বিভিন্ন স্থানে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যান। এ প্রদর্শনীতে ভূগোল ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। এই প্রথম আমরা একটি ছোট ঘর পেয়েছি; সেখানে এবার একটা "পাঠচক্র" খোলার চেষ্টা করছি। একটা আদর্শ ভূজ্ঞান পরিষদে যে সব সামগ্রী থাকা দরকার তার প্রায় সব কিছুই আমাদের আছে। আমাদের পাঠাগারের বইএর সংখ্যাও এবার কিছু বেড়েছে। পরিশেষে একটা কথাই বলব—'কথা নয়—কাজ, ঘোষণা নয়—সাধনা' বাণীটি আমাদের পরিষদের প্রত্যেক সভ্যসভ্যাই বুঝেছেন এবং বুঝিয়ে যাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

সম্পাদক—শ্রীদীপককুমার বসু সহঃ সম্পাদক—শ্রীপ্রসেনজিৎ নাগ

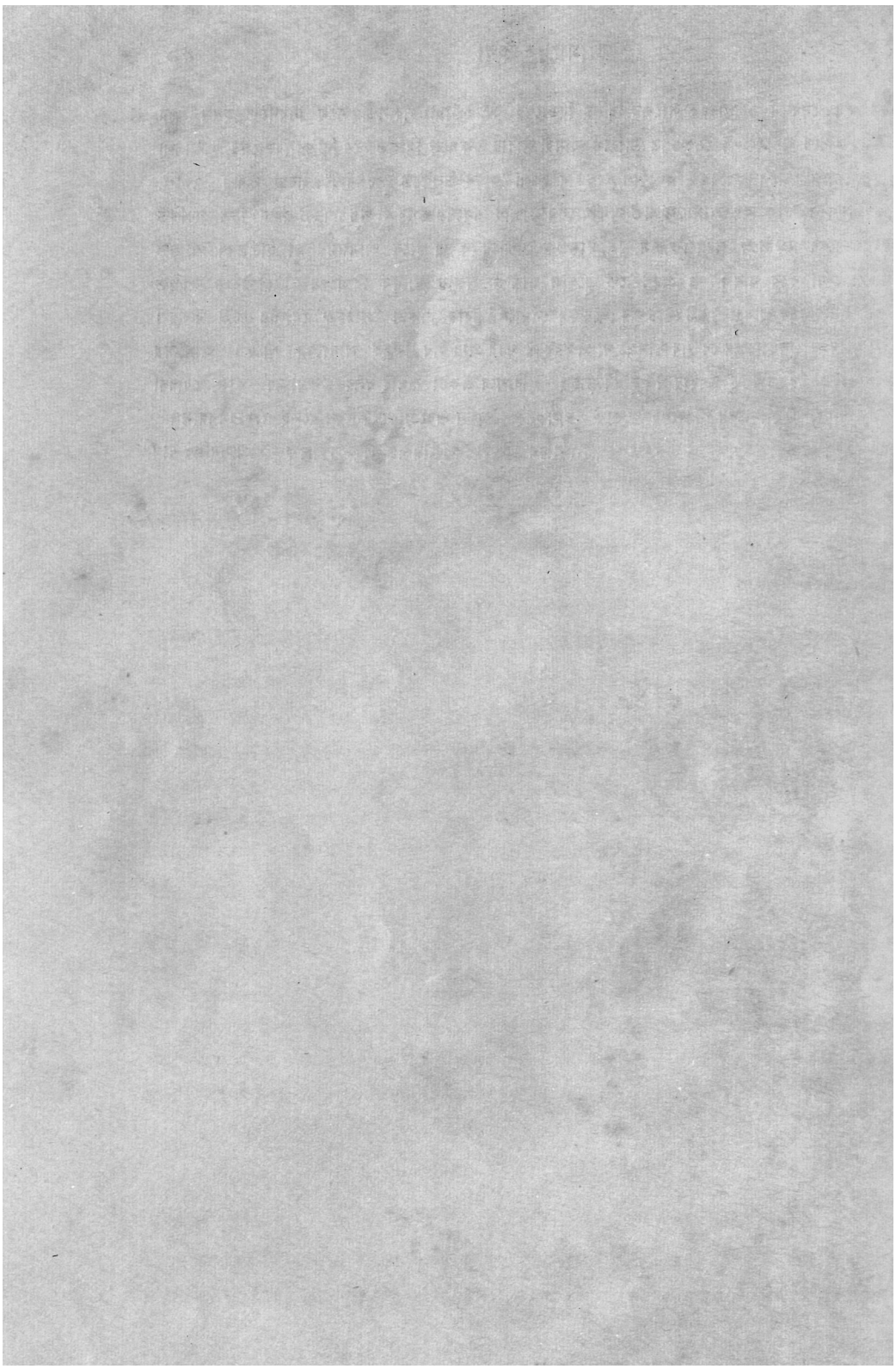

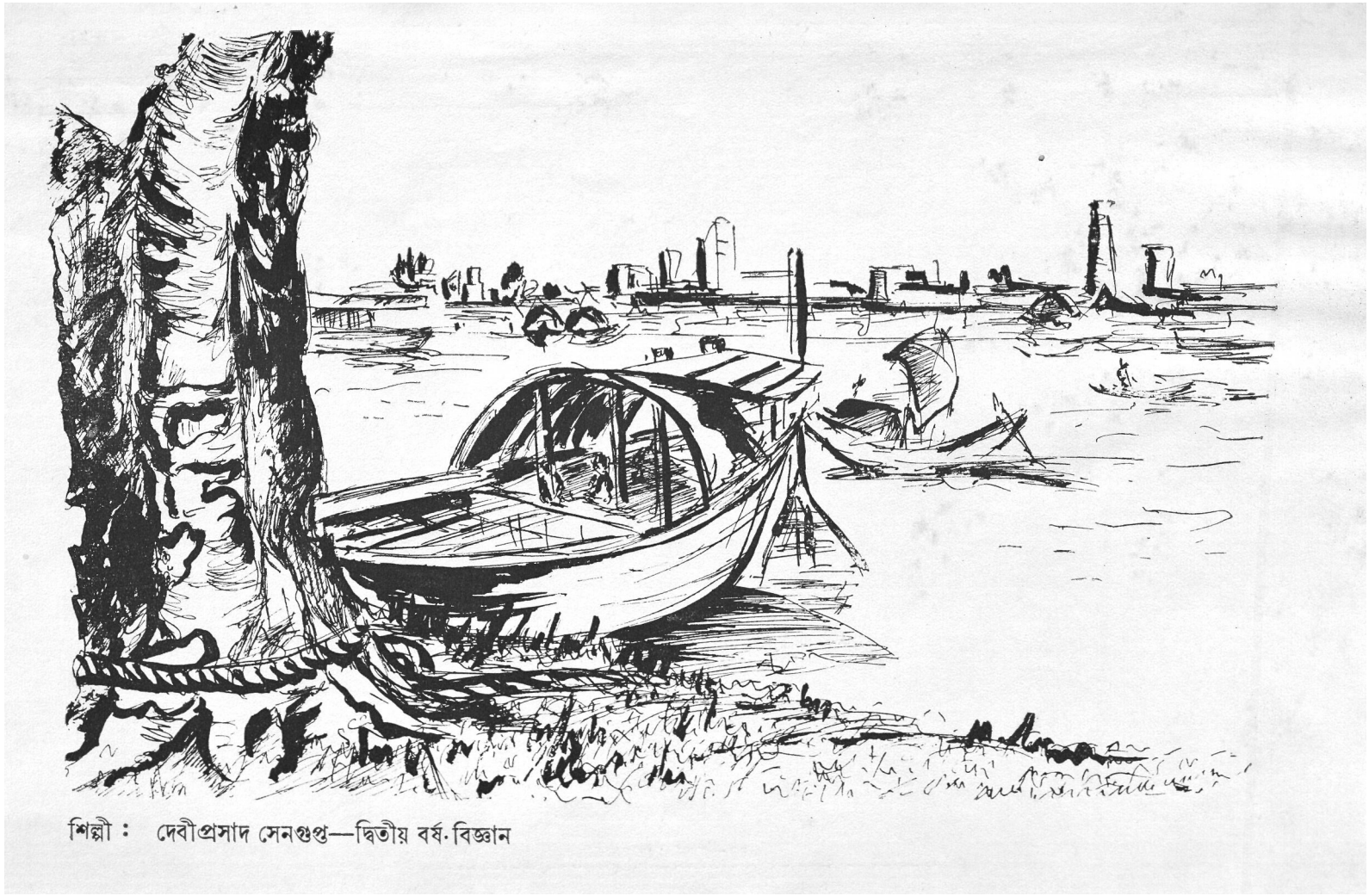

শিল্পী : দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত—দ্বিতীয় বর্ষ·বিজ্ঞান

PRESIDENCY COLLEGE STUDENT'S UNION COUNCIL
SESSION : 1953—'54

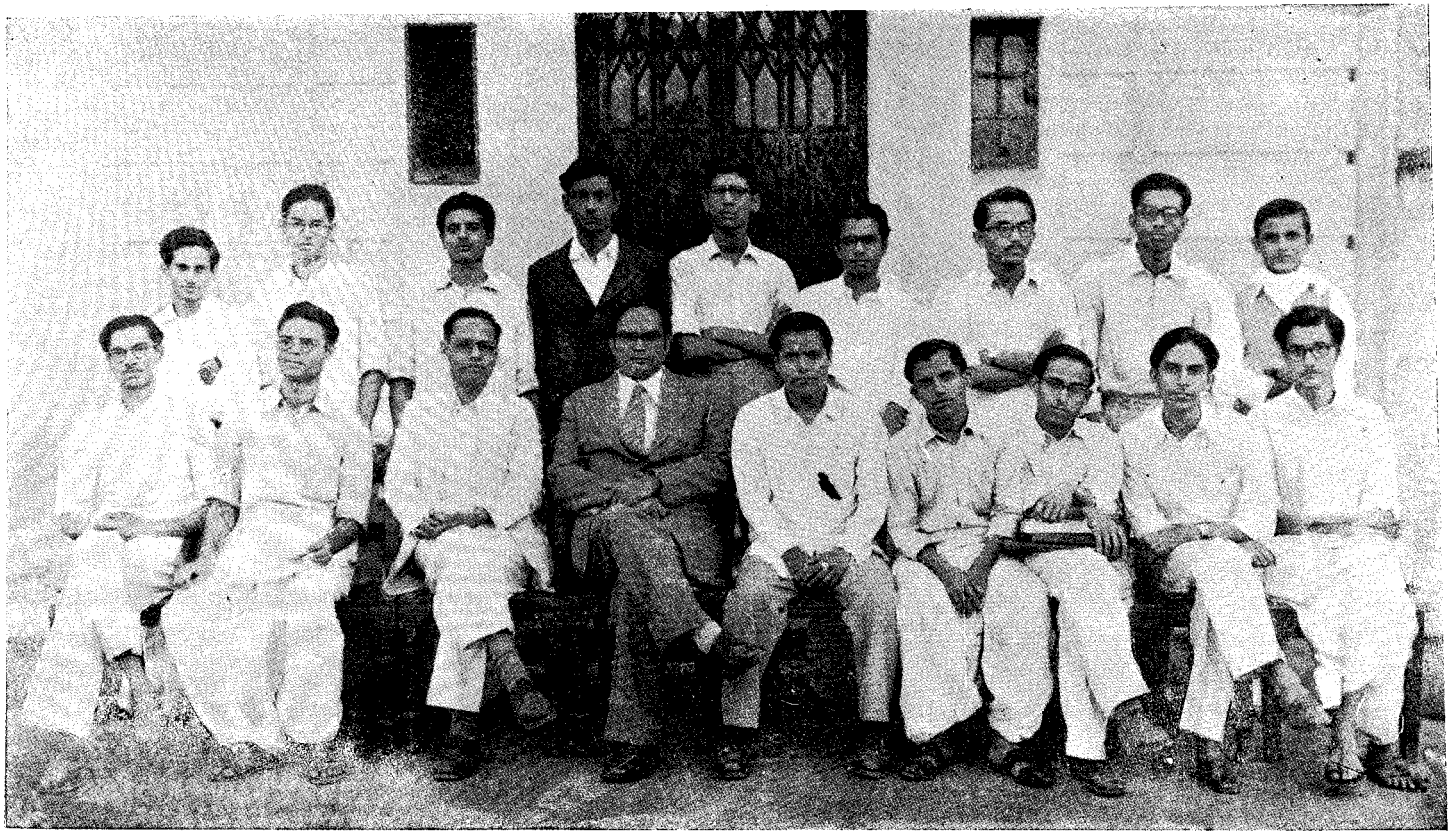

LEFT TO RIGHT—
(*Sitting*) : S. Sen (Drama Secy.); J. Pal Chowdhury (General Secy.); Professor S. Roy; Principal J. C. Sengupta; N. Sengupta (Vice-President); P. Roy (Junior Common Room); S. Sircar (Social Service); A. Dasgupta; S. Banerjee (Debate).
(*Standing*) : S. Sinha; R. Bhattacharjee; R. Das; P. Banerjee; S. Dasgupta; N. Bishnu; A. Chakravarty; S. Saha (Junior Burser); P. Bose.

VOL. XXXVI, NO. 1
FEBRUARY, 1955.

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

EDITORIAL

Recent tradition is on the side of an editor who instead of making a number of disjointed comments on all manner of things under the sun, takes up a definite theme and tries to analyse it. Accordingly, we shall take up the situation of the student today as the subject for discussion. Few people can possibly doubt its propriety.

I

A somewhat pleasant way of describing the student community, following Prof. Henri Marrou of Sorbonne is to picture it as a small privileged group in society which pursues its own occupation, undistracted by the ever-changing present. It is pleasant to contemplate the picture but the reality is so different. Anybody who has some knowledge of the times we live in can ill afford to take *it seriously*. Yet there are people who hold it up only to dodge the real issues. It is necessary that we see through it.

That we are living in a crisis has by now become some sort of a platitude and if stated in a bare fashion, the proposition may very well be irritating. But it gets more vivid when judged against the critical situation of the student to-day. Surely, this is not an isolated problem. We would be simply deluding ourselves to think that it may be solved quite easily only if the powers that be are kind enough.

As a matter of fact, this is part of a much bigger theme—the general crisis of society which affects us all, students or non-students. But since one cannot possibly write about all things at a time, we choose one from a multiplicity of contradictions which a crisis-ridden society always displays.

The Calcutta University has recently done some survey work on the conditions of living of the undergraduate students in this city. The Report published some time ago has been quite effective. Judged by the press reactions, it appears that a statistical dressing up of some more or less well-known facts has shaken public opinion to a great extent. The statistics are

so telling that our Vice-Chancellor writes, "These conditions are appalling in all conscience."

Since the Report has received a good deal of publicity, for our discussion a somewhat brief statement of the more important points will do. The Report throws some light on the income positions of the students. It points out that 13,000 undergraduates come from families whose per capita income is less than Rs. 30 per month and 14,000 from families with per capita income lying between Rs. 30 and Rs. 50 per month. We are further given the percentage figure of students who have to maintain themselves by whole-time or part-time jobs. For the 3rd year students, the figure is as high as 35·47%. A bare statement of the income position is rather inadequate. The Survey provides us with some more statistics, for example, the per capita floor space available at home and in colleges. Excepting for Missionary and Government Colleges, the figure lies between 6 and 9 sq. ft. For middleclass homes, using the term in a broad sense, the same figure comes to about 24 sq. ft. and that also as part of an over-crowded room.

All this information is certainly helpful in explaining the heavy percentage of failures in our examinations. It also serves us, incidentally, with an answer to the much repeated accusation that the students are rather prone to loiter about the streets. There are at least some among the older generation who are apt to think that the youngmen of today are nearly lost for they are so politics-minded. But in all fairness to the students, one ought to consider the miserable situation in which they are placed today. Add to this, the prospect of getting a job which is so remote as to be hopeless. And now one can safely generalize regarding the politics of the students' movements.

Even if the survey has not provided us with something that we did not know before, it has at least done the service of highlighting the seriousness of the student problem in our country. It not merely makes the utterances of our politicians look so cynical and their promises so unreal, it also forces us to study the problem more closely. To understand the problem thoroughly, it is necessary that we link it up with wider issues of socio-economic importance. And only after we have done this can we hope to suggest any remedies.

Talking about socio-economic aspects, it would be indiscreet to generalize on the basis of our limited experience alone. We ought to compare and contrast the situations prevailing elsewhere. To reach a conclusion, we very badly require some more cases under the microscope.

Here are some facts relating to the situation of the student in France.[1] The average amount of a scholarship in France if available at all comes to

[1] For information relating to France, the following journals may be consulted: (1) Le Semeur: La Situation Estudiante en France, 1951. (2) 'Esprit'—April, 1952. (3) P. Mansell Jones —The Cambridge Journal, 1953.

about £65 per annum whereas the minimal cost of living for a student in Paris would dictate a sum two and a half times the present amount. Moreover, 43% of the students have to maintain themselves by part-time or whole-time jobs. In one provincial University, half the students of the Arts Faculty have to earn their own living, some at places 100 miles distant from the centre. As a result, very few students can afford to be present in classes regularly. It has been estimated that three-fifths of the students of France never appear in the classes. This state of affairs is undoubtedly regrettable but the University authorities feel more relieved than otherwise if the pressure of students seeking attendance in the classes relaxes! In the University of Sorbonne, the premier University of France, the Faculty of Law alone has 2,000 registrations while the class-rooms can provide for only 200.

Residential conditions of the students are still worse. There are about 400 menàges where the students are condemned to live a life which is almost tragic. These premises are extremely unhealthy and besides, the diet is very poor. We need not, therefore, be surprised to find the students topping the list so far as the incidence of diseases is concerned. The percentage figure for tuberculosis for the students is six times as high as the over-all national figure.

This, then, is the predicament of the student living in one of the most advanced countries of world. The picture is, indeed, gloomy. But to dispel the gloom, some may refer it to the wartime damages suffered by the country. This, however, is no explanation but merely a side-tracking of the more vital issues. Our analysis of the conditions in the U.S.A. will amply bear out the above point for no similar apology can possibly be offered in that connection.[2]

Here we shall only consider the problems of conducting higher institutions of learning in the U.S.A. Their problems have grown enormous in recent times. The Colleges and the Universities are so much the poorer today, that the Association of American Colleges warned in 1948 that they are "in desperate straits". The situation went from bad to worse in subsequent years so that at the end of 1950 a sum of $15 billion was required to bring the colleges up to a workable standard.

The cost of attending colleges has also shot up. The New York Times, Nov. 27, 1950, estimates that on average an annual expenditure varying between $877 and $899 is the minimum necessary price for any form of higher education. This is a pretty high figure for the vast majority of the people as the study of a Harvard group of social workers points out. Because of these very inflated costs, most parents are not in a position to send their sons up into Universities and Colleges.

It has been estimated that about one third of the student population must earn in order to pay their own expenses. A committee set up by

[2] For data relating to the U.S.A., see the very brilliant book by Gunther Stein: The World the dollar built."

President Truman reported in December, 1947 that America is "allowing the opportunity for higher education to depend so largely on the individual's economic status".

This, however, does not complete the story of higher education in the United States. The College authorities are in an equally sorry plight. Many academic institutions these days resort to commercial ventures.

The Universities are acquiring the look of business enterprises. This is doubly true. First, it is Big Business that controls the whole show so much so that no appointment may be made in any University to-day unless people like Mr. Gradgrind consent to it. Secondly, the Colleges are doing their best to earn money. About this, 'Business Week' of September 10, 1949 wrote gleefully, "It is certainly an infinitely healthier thing . . . . for Colleges to add to their living by business investment than to rely on outright federal subsidies . . . . as has been urged even by some leading educators." 'Business Week' wrote further, "Much of the college news now belongs more to the business-financial pages than in the educational columns . . . To make ends meet, Universities, either as owners or as sole beneficiaries, have taken over the operation of a wide range of businesses . . . . from airports and buslines to pistonring plants."

We have so far considered only those countries which conform to the basic pattern of a free enterprise economy. There are, of course, individual differences but they are overwhelmingly similar. We may now turn to a country which by doing away with so-called free enterprise has succeeded in planning community's production for community's consumption.

We are talking of the U.S.S.R. Here, indeed, is a situation in striking contrast with all that we have so far seen.[3] In the first place, higher education in the U.S.S.R. is completely subsidized by the State. Students get on average a monthly stipend varying from 220 to 600 roubles, depending on the nature of study and the duration of the course. Those who are better than the average receive 25% in addition to the usual amount of the stipend. These stipends are more than sufficient for students' purposes. A student in a 'higher school' in U.S.S.R. has to pay a monthly tuition fee between 25 and 35 roubles a month. Besides stipends, there are several other amenities which the student can enjoy *e.g.*, health resorts, pleasure trip allowances etc.

II

This very unusual contrast between the two worlds may naturally make us rather curious. We may be interested to know why education is running to rocks in countries where democratic tradition is so deeply cherished. It

[3] Concerning U.S.S.R., see (1) Beatrice King—Russia goes to School; (2) S. and B. Webb—Soviet Communism; (3) I. G. Petrovsky—Higher Education in U.S.S.R.

is, indeed, queer to observe that the 'totalitarian' Russia spends about 7% of its national income on education while the 'democratic' U.S.A. spends only 2%, half the sum the Americans spend in gambling every year. The difference is by no means too slight to be ignored. It appears that in our 'free' world there are far more important things to be looked after, for example, the football polls, the stock exchanges and on top of it all, the preparation for a war. The items are just illustrative. What emerges is the significant fact that the business of educating people is considered to be the least profitable of all businesses. Needless to say, it reveals the attitude of a social milieu that has its interest centred only on the art of acquiring money. Higher education is being given such scant attention in our democracies not only for the all too simple reason that it ranks so low in the value system of our 'rulers'. This neglect is something in the very nature of an unplanned economy resting on private profit calculations. In Max Weber's terminology, it is the difference between private rationality and social rationality that lies at the root of the present maladies. Education is meaningful in our society only if it yields a high rate of return in money terms. The problem here is not to raise the cultural level of the people. Rather it is how to maximise profits. At present, spending on education is too bad an investment to be undertaken in countries such as ours. For a mature economy, there is the problem of demand deficiency that always looms large on the horizon. If peace-time American industries cannot absorb even this very restricted number of graduates, how can we expect the American businessmen to be enthusiastic about extending higher education? The problem in an underdeveloped economy is just the other side of the picture. In one case, it is excess capital that inhibits employment. In the other, it is capital shortage that makes the problem of unemployment so intractable. We may be prone to suppose that where private initiative is lukewarm, the State may step in to fill up the gap. As a matter of fact, there are some people today, notably the welfare state theorists, who would like the police State of the 19th century to blossom into a Father Christmas State in this mid-20th century. Judged critically, there is more of wishful thinking in such a melioristic attitude than an understanding of the real historical processes.

Consider the way our modern States are behaving. In the United States especially, the armaments production has run into astronomical figures and the Federal Government is spending a huge sum on defence expenditure every year. For the fiscal yetar 1950, the defence expenditure alone amounted to 52% of the total budget whereas the combined estimated State outlay on social security, housing, health, education and labour comprised only 8%. As compared with 1939, the military spending has grown by 2200%. Again, the government classification has its own logic. $50 million appropriation for the F.B.I. is included in the category of "Social Welfare, Health and Security'!

In India, the accent of government spending is no different. We are, of course, not living in a war-economy but judging by our limited resources, we are spending an inordinate amount on defence. For the Fiscal Year, 1954-55, the estimated defence expenditure comes to 205·62 crores or 45·6% of the total central budget. The government is at present trying to carry out a 5-year plan for reorganising the economic structure. But it is rather queer to observe that compared with the pre-plan year 1950-51, defence expenditure has increased by 40 crores. Whether all this expenditure is necessary in absolute terms, we cannot possibly examine here. But that education is being neglected cannot be denied. The Planning Commission makes recommendations for restricting higher education only to the most competent few. It considers the raising of the age limit of admission to Universities a very urgently needed reform. But it pays little attention, if any, to the problem of minimising the costs of higher education. No elaborate programme is being envisaged of changing the 'literary' character of the present education so that we may have many more technically competent people. The problem of skill formation is a very important one in development planning. And a planning commission that fails to consider it in some detail is doing much less than what it is expected to do. Since the alternative sources of finance for higher education practically do not exist in our country, the neglect shown by the State is really dangerous. If the objective is to utilise our manpower fully, it is time that the government threw away its characteristic thriftiness with regard to education. For the year 1950-'51, the budgeted expenditure on education amounted to Rs. 1·72 crores out of a total of 343·9 crores—a really insignificant amount. From this, it is rather easy to see that the fact of under-development of the national economy cannot alone explain the striatened finances of the Colleges and Universities.

III

Our task in this editorial was primarily reporting. But any report remains incomplete if it does not end with some suggestion or other. Our discussion has emphasized at least one point, that the student problems and the broad social problems are very closely interwoven. Consequently, it is rather superficial to consider the former apolitically and in abstraction from the prevailing economic conditions.

It is, indeed, too much to hope that in the so-called libertarian countries such as ours, education may hope to attain a status as high as any other profit-making activity. It is a far cry from a war economy to an economy directed to satisfying the rising material and cultural requirements of the great masses of people. But in so far as we struggle for peace and try to reduce the war tension which at present accounts for much of the malaise, we move a step nearer to attaining a social order conforming more closely with civilized values. Only in a society where the fact of profit as the organising principle has been

abolished can we hope to find a genuine concern for education, an ardent desire to assimilate and extend our human heritage.

All this, however, is on a general plane, so general that they do not mean much in the context of immediate problems. A specific set of problems surely demands a specific approach and in this connection, we may relevantly refer to the experience of post-war France.

The French National Union of students on an all-party basis drew up a Declaration of Students' Rights and Duties in April, 1946. This charter is generally known as the Charte de Grenoble. Since its first acceptance, this charter has served as the basis of many united student movements in that country. It has led to significant improvement in the living conditions of the students. For example, social security has been extended to the students, university fees have been reduced, etc.

Here are a few clauses from this charter. (1) The student is a young intellectual worker. (2) As a youth the student has a right to special protection on the physical, intellectual and moral planes, and (3) to be integrated into the ensemble of the youth of the nation and of the world. (4) As a worker the student has a right to work and to leisure in the best conditions and in material independence, both personal and social, as guaranteed by the free exercise of syndical rights. (5) As a worker the student acknowledges his duty to acquire the best technical competence. (6) As an intellectual he has the right to engage in the search for truth and to that liberty which is its first condition.

No objection can reasonably exist as to the principles enunciated in this historic document. This charter may very well be adopted by our student organisations. That will, of course, be the first step. The next important thing is to make the general students realize its importance and then unite to give a concrete shape to its articles. To any rational being, it should be beyond doubt that a student ought to be granted a minimum living wage and certain other amenities so that he may do his own duties as a student. It is not possible to outline any comprehensive remedial scheme here. We must insist however that the state take a far greater intiative in this matter than it has so far done in our country. It ought to subsidise the Universities for expanding the engineering and science departments. Students must be provided with more books, more scholarships and also, better residential conditions. In case the students live with their parents as they chiefly do here, there should be family allowances to meet the expenses of higher education. All this will, of course, require increased funds for education. The government may do either of the two things. It may divert more real resources for educational purposes at the cost of certain other items in the budget, notably defence. Or, it may enlarge the total itself. This increase in the total ought to come about not through increased taxation on the greater portion of the community but by a more steeply graduated income tax, tax on business profits

and also by abolishing intermediaries in land. Land reforms together with an expansion of the public sector mostly brought about by nationalizing foreign business would go a long way in providing the government with adequate funds for development purposes. Either way, it will mean the hostility of the propertied classes. But a country which cares for democracy can ill afford to neglect the problem of democratising education.

A democratic system of education is one which is not biased in favour of any particular group in society. It knows no discrimination among students and indeed opens out the horizon of higher education to all capable people, irrespective of their status in society.

Such democratisation is too badly needed in our colleges and universities. All the misery that surrounds a student's life here as elsewhere merely reflects the way education is sought to be confined to a small number of people. Presumably, the idea is to create an élite, an idea that all too clearly bears the mark of its mediaeval parentage. If the universities are to cease functioning as medieval institutions, all students must be given full scope for developing their personalities. By a carefully devised programme of subsidies and an over-all plan for increasing employment opportunities, we may enable an important section of the community to do its duty of promoting and sharing the means of education and develop a proper sense of history such as forms the basis for any meaningful social activity. And education, instead of being relegated to the category of a somewhat unprofitable enterprise, must receive an importance which, in all fitness of things, it certainly deserves.

The Myth of the Welfare State

AMIYA KUMAR BAGCHI, 4th Year Arts.

The Welfare State is being held out by the Indian National Congress today as the only desirable social order to which its leadership is surely guiding the ship of the state. But on looking closer the welfare state turns out to be a much more shrunken creature bloated by the wind of idealism. The supporters of the welfare state suggest that it is nothing but the logical outcome of regarding the government as "servant of the people". Instead of leaving the share of the social cake to be determined by the jungle law of tooth and claw, the state accepts the responsibility of guaranteeing a minimum national standard of economic welfare to all people irrespective of their contributions to the national output. On a broader view, the supporters of the welfare state expect the power of the state to be directed towards providing the external framework for the healthy development of the individual by annihilating the five "Giants" —namely, want, ignorance, idleness, squalor and disease. Ensuring the security of the individual by means of social action is the ostensible goal of the welfare state.

For this purpose, it introduces an unemployment insurance scheme for protecting the unemployed from distress and starvation; the idea is to collect money from a person when he is earning and paying him back when he is idle. In times of prolonged stagnation of conditions of trade, an unemployment assistance scheme financed by government may be introduced. The old-age insurance scheme and the national health service serve the aged and the invalid respectively. In effect, the welfare state looks upon the individual as an end in himself, and not merely as a means of production; it recognises those incapable of looking after themselves as legitimate claimants of the gifts of social life, for the society has been unable to keep their affairs in order.

Most of these services were introduced in advanced countries long before World War II. The new features in the development of the concept of welfare state are (*a*) the acceptance on a state level of the ideal of a minimum economic welfare for all, (b) the acceptance of the duty of reducing unemployment to a minimum by keeping industry and agriculture in a sound condition. The instruments of progressive income tax, family allowances and low-cost housing are used for redistributing income so as to bring about a greater amount of economic equality. But greater economic equality is not only a goal; it is also a means. For, the poor have a tendency to spend a greater proportion of a given increment of income than the rich; hence, in

times of slackening demand, greater purchasing power in the hands of the poor will help sustain demand.

Minimum wage legislation, farm price support and steep rates of protective tariff which constitute a barrier to the onslaught of foreign goods are instrumentalities in the hands of a government for keeping the economy on an even keel. The nationalisation of key industries like steel, electricity and of essential services and raw materials, like transport, coal etc. has been the latest feature of this strand of welfare state. This development has led many conscientious people—for whom socialism is a bogy—to doubt whether the Welfare State is not navigating dangerously close to the blasted shore of the Socialist State where individual initiative, it is said, is engulfed in a total will imposed by the group controlling the whole of national life.

II

If we are to analyse separately the different strands of this parti-coloured concept, and determine whether it is a new being come out of the heaven, or the devil of socialism sneaking into Eve's innocent bower, or the illegitimate child of capitalism striving to hide its shameful parentage, we shall have to rummage the annals of the social laboratory whence the mixed economy emerged.

It looks like a paradox that this idea had its beginning in Germany—the land of the Kaiser, and Junkers and military lords; that it blossomed into youth in the gloomy, suffocating atmosphere of the thirties; and that it seems to have reached the zenith of its glorious life in the problem-ridden post-war world. The votary of the welfare state will exclaim "You fool! you don't see such an obvious connection? The Welfare State is the *mushkil āsān*; it breathed new life into oppressed Prussia, it lifted the gloomy shroud of death in the thirties; it is the saviour of the post-war world." The Sceptic bows his head in acquiescence. Yes, it is the *mushkil āsān*; it is the straw which capitalism has caught at for saving itself from the fate of being drowned by the currents of change.

Capitalism grew by breaking the social barriers hindering the accumulation of capital; it prospered through the Industrial Revolution which gave such an immense fillip to the system of capitalistic exploitation.

Capitalism is fundamentally a process of economic change; the development of the capitalistic system of production implies the existence of dynamism in the economy. It has aptly been called the process of "Creative Destruction"; it destroys old products to create new ones; it ousts an old method of production to place in its stead a more efficient method of production; it breaks up old firm to make room for the new firm. But we must remember that the motivating force behind all this is accumulation of capital. Hence anything that tends to threaten the realisation of this profit-motive and

anything that places obstacles in the process of creative destruction will also hinder the evolution of capitalism.

Capitalists produce in response to demand. They will go on installing plants and factories only so long as their products can be sold. But the power of a market to absorb goods is limited; hence new avenues for the sale of goods must be opened up. Up to the first decade of the twentieth century, these avenues were provided by the development of new products and new methods of production, by the expansion of territory—like the colonisation of India and China, and the growth of population. When depression took place and workers were laid off, demand decreased further because people had less money to spend; but recovery was propelled by the factors noted above. Again there came a crisis and another recovery.

But certain factors disturbed these rhythmic systoles and diastoles of the capitalistic system—among them were the growing competition between advanced countries of the world, the industrial development of colonies and the growth of monopoly capital. In the post-war world imperialists are meeting with formidable resistance not only from the masses but from the bourgeoisie also of the undeveloped countries.

So long as the capitalist was a small producer, he could not effectively suppress competition, but now the monopolist can operate on a massive scale, utilizing the political machinery when required to prevent profits from being threatened by inventions and innovations. But this power to defend the sacred preserve against potential challenges reduces the prospects of recovery of the capitalistic system. The development of a unified production process involving the integration of various stages of production into a continuous, mechanized production-flow has lessened the adaptability of the productive system to changes in demand, and thus added to the embarrassment of the new "industrial baronage", since a slight decrease in demand leads to the piling up of excess capacity.* Monopolies have also intensified the class struggle firstly because small capitalists are being degraded to the level of the proletariat and secondly because there has occurred a divorce of ownership from direction in corporations. To-day private ownership is not an essential condition for the direction of a business, so that private capital is increasingly being endowed with the character of social capital.

Now the Welfare State, this benevolent-looking fellow whose character we are probing into—was meant to serve two ends: to rescue capitalism from the 'fetters of straitened markets' by providing sales outlets in the form of communal consumption, to blunt the edge of class-struggle by putting a veneer of apparent equality upon the petrified class-structure into which monopoly has pushed capitalism.

People in a capitalist economy try to hoard purchasing power in the

*Monopolies tend to maintain rigid prices and restrict output, and also add to economic inequality and thus tend to increase the burden of unemployment.

form of money; especially in a depression they cannot be relied upon to spend money in their private capacity because the feeling of insecurity is then the greatest. Hence the government provides demand for industries in financing communal consumption out of taxes and borrowing. The redistribution of income, however, is sham; for, if we study American statistics, we find that the ingress into the upper classes from other classes has become restricted, that the son of a peasant now stands little chance of becoming a businessman, however hard he may try. In the youthful days of capitalism, it required ability to found a corporation; but to-day little ability is required to maintain a position already acquired, and conversely only ability will not ensure an ascent up the social ladder. Federal taxes in the U.S.A. everywhere block the way of the new man.

Thus the Welfare State is benevolent only for capitalism; capitalism now incurs the grave danger of being outpaced by the forces of production. The Welfare State is bribing the underprivileged into the continued acceptance of an ossified institutional framework which runs the double danger of becoming unnecessary as a mode of organization and of precipitating this clash between the decaying class and the rising class.

III

Will the Welfare State succeed in guiding capitalism out of the danger zone? It is evident that the Welfare State is a transitional form combining in itself elements from both the socialistic and the capitalistic systems; it depends on a nice balance of conflicting class interests—the interest of the capitalist class *to continue in* making profits by stabilizing the system and of labour class to increase its share of the national income by pressing for higher wages; hence we can easily see that such a system will be inherently unstable. A whiff of wind, a slight knock on the 'myth' of capitalism may be sufficient to upset the precarious balance and bring about the postponed revolutionary change.

Whatever else the Welfare State may be, it is evident that it does not conform to the traditional ideal of free private enterprise, in the sense that goods and services are produced by private enterprise in response to choices registered by consumers through the price mechanism. It is no longer true to say that goods and services will flow unimpeded wherefrom they bring the greatest amount of remuneration. The State undertakes to provide certain services to all universally; what is more significant, the State assures security to all; it puts investment into a strait jacket in order to make it behave in a less capricious manner. Capitalism evolved by the elimination of the inefficient and the triumph of the more efficient. The new measures restrict this process of elimination and also impede the rise of the newcomer into the higher social stratum. The group of successful businessmen seeks to perpetuate itself, and the new welfare state builds a

hedge around it. But destruction in order to create is the very spirit of capitalism. Can you preserve the body by squeezing out the life?

The liberal reformist would argue that the Welfare State will not respond automatically to the blind urge for security, the State will not give a guarantee that whatever is produced will be sold. In fact, if need be, it will take over industries from private business and subject them to public control, to the National Board. This proposal to allow a slight amount of unemployment just to punish the labourers will also serve another end: in a full-employment situation, the labour market is transformed from a buyers' market into a sellers' market and labour becomes obstreperous in its demands for wage increases. This proposal will serve to "discipline" labour by the possibility of making the threat of unemployment effective, in case of misdemeanour. This would also serve to reconcile the outraged individualist who would ask that the individual should make decisions on his own and accept responsibility for the outcome of those decisions (this viewpoint, however, does not denounce voluntary associations of individuals, for example, cartels) and who would also argue that a little amount of turbulence in human life satisfies the combative and pugnacious element in man and prevents him from being apathetic to creation for self-protection.

But the conditions for the success of this liberal reformism are no less severe than those for the success of gradualist socialism. One condition is that economic power should not be able to radiate political power and influence the political machinery for compassing its own ends. It is now well-known that Fascism largely drew its support from Big Business and that lobbyists of finance capital in the U.S.A. are powerful enough to cajole and coerce legislators into abandoning the charge of the people in favour of Big Business. Political democracy serves the whole society; but it is still a society which is permeated by social and political power of capital. The second condition would be that capital should be able, if need be, to abandon the objective of its own self-expansion; there has not occurred anything to warrant the hope of such a transformation of capital. Increased drives for markets, and sky-rocketing armament programmes (which, by the way, have the unique advantage for capitalism of not creating but having the potentiality of destroying productive capacity) rather point to the accentuation of the capitalist crisis.

The attempt to introduce an element of security into the cruel process of elimination through competition will accelerate the regulation of the entrepreneur into the category of historical relics. Technical progress and innovations had so long been a handmaid of the entrepreneur for opening up new sources of profit; the pleader of monopoly capital had also argued that the reservoir of excess profits would supply the funds necessary for technical progress. Now, in an atmosphere of greater certainty and security, the task of achieving technical progress will increasingly be handed over to organisations of experts and specialists. Moreover, in the early days of

capitalism, the entrepreneur had to fight against the force of inertia and drag the people out of the accustomed groove, when introducing a new method or a new product. But in a world of lightning changes, people have become used to changing their modes of life every day; hence resistance to new things has decreased, people accept them with very slight demur.

The Welfare State programme will fail, because in the sphere of economics, it would take away the raison d'etre of capitalism which it seeks to preserve, by transerfering the seat of technical progress to other hands and removing the risk which justified a return to the capitalist's function. In backward countries, this programme will conflict with long-run development programmes which will necessitate austerity in the immediate future and even inequality in non-socialist countries. In advanced countries, it will diminish incentives and hence will require a greater and greater amount of public expenditure if we want to realise the full amount of national income which is going on increasing.

In the sphere of politics, the idea of a Welfare State serving all classes equally will lead us nowwhere; for, as we pointed out earlier, economics and politics are not two separate compartments between which interflow can be prevented. The instrument of coercion, which the State fundamentally is, will be operated by the capitalist class in a capitalist society; economic power will give them a sufficient weight to enable them to control the political machine. In that case, to think of the State as impartial between classes will imply the assumption of such an amount of altruism as is not found to be resident in the human breast. In asserting this, we are not meaning anything more sinister than the fundamental individualist contention: that every man can possibly be guided only by his own knowledge and self-interest.

Finally, the Welfare State programme, if implemented fully, will take away the scourge of unemployment which has hitherto served to discipline the working class into submission to the status quo. This removal of the army of the unemployed, coupled with the accentuation of the class struggle which results from the development of monopolies and the euthanasia of the entrepreneur will land the capitalistic system in that very crisis which it seeks to ward off.

The English Revolution

ARUN KUMAR BHADURI—*Fifth Year Arts.*

The political explosion which shook England in the forties of the Seventeenth Century gave a tremendous impetus to the forces of change which had already been in operation. The Long Parliament, dominated by the new landed gentry and the upper bourgeoisie at least in the Lower House, met in November, 1640, after eleven years' arbitrary rule of Charles I without Parliament and like the French States-General started demolishing the old feudal regime with its accompanying evils.

The House of Commons, under the leadership of Pym, showed a perfect unanimity in abolishing the arbitrary powers of the Crown. This was manifested in a series of measures—taxation of all sorts to be imposed with the consent of Parliament, Parliament to be summoned every three years proclaimed by the Triennial Act (1641), prerogative Courts (the Star Chamber, High Commission) to be abolished. These were supplemented by the punishment of Strafford and Laud who by words, acts and counsels tried to subvert the fundamental laws of the realm.

The upper bourgeoisie which dominated the House of Commons was not a homogeneous entity and divisions in its rank were soon to arise on a formidable scale. The Root and Branch Bill split the Parliamentarians into two groups—on the one hand, the moderates or the reformers who wished merely the abolition of a few offensive formulas and ceremonies of the Prayer-book and the retention of the Episcopacy in a limited form; on the other, the Extremists or the Abolitionists who wanted the abolition of not only the Prayer-book but also of the Episcopacy. It is to the latter group that Pym, the leader of the future Presbyterian Party and Oliver Cromwell, the leader of the Independent Party belonged. The moderates or the Constitutional royalists like Hyde, Falkland were satisfied with the reforms already achieved and were more willing to trust the King with the Constitution than Parliament with the Church and took sides with the King in the Civil War.

In face of a second army plot and a rebellion in Ireland, in both of which the King's Connivance was suspected, the Parliamentary leaders determined on an appeal to the people for support. The appeal was made in the Grand Remonstrance, containing accumulated grievances of Charles's reign, the record of the past work of the Parliament and its future programme of action. In retreat before the Parliamentary offensive, the King's attempt to arrest the five M.Ps. including Pym and Hampden drifted the matters to a crisis and the storm broke.

The progress of the First Civil War between the Crown and the Parliament synchronised with popular tumults, general social unrest, riots against enclosures and the rise of Independent Congregations, free from any supervision and control. The course of the Civil War also witnessed a sharp split between the moderates and the extremists of the popular party in the Parliament which had been unanimous on the Root and Branch Bill. The moderates or the Presbyterians represented the viewpoint of the Root and Branch Party and could not agree with the political and religious convictions of the Extremists or the Independents who, like the Anabaptists, believed not only in "Church democracy" but also in "State democracy" and allowed no fetters in their right to interpret the Bible for themselves. While the Presbyterians proclaimed the sovereignty of Parliament and justified its claim by historical precedent, the Independents proclaimed the sovereignty of the people and based its claim on an appeal to natural rights. Socially, the former represented the big landowners and upper bourgeoisie, the latter the petty bourgeoisie, the independent craftsmen and the rank and file. But the moderate Independents had their leanings to the upper strata of society.

The Conservative Parliamentarians represented by the Presbyterians were alarmed at the growth of radical movements and worked for a compromise settlement with the King rather than for complete victory. They hoped to defeat the Cavaliers with the help of a Scottish army and so avoid arming their own people. By the Solemn League and Covenant, they called in a Scottish army, officered by Conservatives, to offset the radical forces which were gathering under Oliver Cromwell and which wanted to carry the war to a victorious conclusion.

Oliver Cromwell was the leader of the left-wing Parliamentarians represented by the Independents. He thought the cause was worth fighting for; wanting to break the stubbornness of the King, he did not mind if the vulgar and lower orders helped to beat him. He championed religious toleration and it was in religion that Cromwell represented the Independents more completely than in politics. In spite of the victory at Marston Moor (July, 1644) over the royalist forces, success of the Parliament had been appallingly slow. So, both the more radical Parliamentarians and those who desired an efficient army called for the formation of a "New Model" paid by the Parliament and under the command of one man. This was achieved in 1645 by the Self-denying Ordinance which founded the New Model Army under the command of Cromwell. The Army had been a stronghold of Independency especially in its lower ranks. The removal of Conservative officers and of local control made easier the development of radical and sectarian ideas among the rank and file of the New Model and its electrifying effect was revealed at the magnificent victory of Naseby (June, 1645) which practically terminated the First Civil War.

The temporary ascendancy in the House of Commons enjoyed by the Independent Army passed to the right-wing Presbyterian leaders as soon as

the war was over and the dispute with the Scots settled. In February, 1647, the Presbyterian majority in Parliament decided to disband the Army without providing for huge arrears of pay. The step was dictated by the Conservatives' desire to finish with the revolution and by the fear of the radical tendencies of the Army. The rank and file petitioned Parliament to reconsider its decision and elected their delegates called "Agitators" to represent their views. The rank and file having taken the lead, the Agitators swayed by democratic ideas employed a judicious combination of encouragements and threats to bring the officers into line. The officers, drawn largely from the Yeomanry and upper bourgeoisie, feared the extremism of the Agitators and were, in consequence of disagreement with the latter, purged out of the Army.

The expansive nature of the radicalism in the Army drove the Presbyterians in the Parliament to plot an agreement with Charles I at the former's expense. To forestall the Presbyterian plan, the Agitators took direct action on June 3rd, 1647 by seizing the person of the King.

This increasing preponderance of the Leveller elements in the Army brought about a division between the Moderates and the Extremists. The Extremists led by the Agitators presented the Agreement of the People to the General Council of the Army at Putney in October, 1647 and clamoured for universal suffrage. "Every man born in England", argued Rainborough, "the poor man, the meanest man in the kingdom ought to have a voice in choosing those who made the laws under which he was to live and die." Cromwell and Ireton who represented the views of the Moderates and the purged officers of the Army could not relish universal suffrage. Avowing that the good of the people was the end of the Government and admitting that all political power was derived from the people, Cromwell denied the conclusion of the democrats that a republic was the only legitimate government for England. He further argued that in proposing any important political change, the first thing to consider was 'whether the spirit and temper of the people of this nation are prepared to go along with it'. For Cromwell the choice between a republic and a monarchy was only a question of expediency and dependent on circumstances.

With social and economic interests basically rooted in those of the Conservative Parliamentarians, Cromwell struck at the Agitators and dissolved the Army Council.

Meanwhile, Charles hastened his doom by plotting with the Scots and negotiating with the Presbyterian party of the Parliament on terms he had no intention of keeping. The Second Civil War united the Crown with the Presbyterians which repentant of the democratic revolution they had unleashed sought to arrest its progress. Cromwell who could not go to the length of the Presbyterians in bartering away the gains of the revolution led the Army against them. The Army victory at Preston (August, 1648) shot Cromwell to prominence and sealed the fate of the Presbyterians and

the Crown. The Pride's purge excluded 140 members leaving only a "rump" of 90 to carry on the business. This was followed by the trial and execution of the King and the establishment of the Republic.

The Republic had to face double challenges from the Royalists and Presbyterians on the Right and the Levellers on the Left. The Royalist challenges manifested themselves in Ireland and Scotland in the nature of the support of Charles I's son against the Republic. In Scotland the Royalists combined with the Presbyterians to attain their ends. Cromwell rose to the occasion in responding vigorously to these challenges. But the more formidable threat came from the Left. The Levellers were divided into two groups. The left-wing Levellers or the Diggers demanded sweeping social changes without which 'the Republic is a mockery'. "Unless we that are poor have some part of the land to live upon freely as well as the gentry, it cannot be a free Commonwealth." The Diggers led by Winstanley asked for the right to establish themselves on the commons and waste lands and dreamed of a socialistic republic in which there would be no private property in land, and neither rich nor poor. It was only vaguely and unconsciously that the Diggers dreamt of a good old society. Judged in the proper perspective of the then condition, the Diggers' movement could not have been a conscious and consistent one. The right-wing Levellers were political democrats and had no desire to level men's estates or make all things common. They modified their "natural right" with a kind of property-qualification.

Fortunately for the Republic, the right-wing Levellers sharply disagreed with the Diggers and the two could never combine. So when the Diggers' attempt at communal farming on St. George's Hill was disrupted and the Leveller revolts of 1649 led by Lockyer and Thompson were crushed, no help from either side was forthcoming.

If Putney debates revealed symptoms of Cromwell's right-wing move, the suppressions of Leveller and Digger revolts were clear manifestations of this tendency. This became further explicit when the Rump Parliament brought in the "Bill for a new Representative" providing for the union of legislative and executive powers in a single body and a succession of perpetual Parliaments always in session. Cromwell was so alarmed at its radical tendencies that he dissolved it. The last attempt at a deal with the Left occurred with the setting up of the Barebones Parliament; but that proved too radical in its approach to reform of the law, the Church and taxation, and met the fate of the Rump. The Instrument of Government which made Cromwell Lord Protector redistributed the Parliamentary seats and franchise on the basis of property-distribution in the country.

In spite of Cromwell's drift to the Right, it is undeniable that he secured and consolidated the basic gains of the bourgeois revolution. The translation of the law of England into English and its codification ensured simplicity in legal code and administration pioneering legal equality. The

Crown and Chapter lands sequestrated by the Revolutionary Committees in the counties were disposed of to the bourgeoisie and new landed gentry. These land transfers expedited the transition to fully Capitalist tenurial relations. Commissioners were appointed to ensure a more or less fair assessment of the taxation. In 1655 the Cavalier landowners had to pay a special decimation tax of one-tenth of their rent in addition to the normal tax. Grant of privileges to the city trading Companies and the introduction of hardly any measure against enclosure, however loathsome to small merchants and the poor peasants, secured the interests of the big bourgeoisie. Cromwell's foreign policy further facilitated their interests. The Navigation Act (1651) practically crippled the Dutch carrying trade and fostered the English shipping. The Anglo-Dutch War (1652-4) which resulted in consequence ended in victory for England and the practical elimination of Holland in the race for colonial and commercial expansion in the world. This was strikingly revealed in the vigorous English enterprise to win bases in the West Indies, the Mediterranean and to open up the Spanish America to English trade. Capture of Jamaica was the reward of these persistent endeavours.

Judged against the background of the larger interests of the upper middle classes, Cromwell's gradual swing to the Right in the face of the Leveller movements becomes easily intelligible. The Army was the democratic centre. In spite of repeated purgings of the Leveller and Quaker elements from the Army, the radicalism of the representatives of the First Protectorate Parliament could not be stamped out. Their endless debates on the basis of the Instrument of Government terrified Cromwell into its dissolution. He decided to disband the Army which, according to him, was the source of all trouble. But in order to disband the Army the social basis of the regime had to be widened to the Right. Cromwell came to an agreement with the Presbyterians, and accepted their Humble Petition and Advice in 1657. That Constitution based on a limited franchise brought together again the social elements whom the Presbyterians and moderate Independents had represented. But so long as the Army existed the alliance was weak, and it broke up after Cromwell's death. Confronted with a new threat of social revolution, the propertied parliamentarians who had got all they wanted from the revolution began to wish for a deal with the Cavaliers and a restoration of the monarchy.

The restoration of King, House of Lords and Bishops did not mean a restoration of the old order. The revolutionary legislation of the Long Parliament (1640-2) was confirmed. Lands privately sold out were not restored after 1660. The old landed ruling class which was not extinct had to adapt themselves to the new order. The Navigation Act was not repealed. Cromwell's colonial and commercial policy was given a powerful impetus in the Second Anglo-Dutch War (1665-7). The legal uniformity established by Cromwell considerably prepared the ground for legal equality enshrined in the Habeas Corpus Act (1679). That the liberal ideal of Parliamentary supre-

macy was an accomplished fact in England in the post-Restoration period was revealed by at least two instances. The Parliament having suspected the secret designs of Charles II in the Treaty of Dover (1670) raised a terrific opposition, and brought about England's withdrawal from the Dutch War. Again when Charles attempted to pass a Declaration of Indulgence (1672), suspending the penal laws against the Roman Catholics and Dissenters, the Parliament objected. Charles had not only to withdraw the declaration but also to agree to a Test Act (1673) by which no one was to hold any office of State who refused to take the sacrament according to the Church of England. When James II who took the fiction of his sovereignty seriously tried to re-establish absolutism, the real nature of the Compromise of 1660 stood revealed. The Tory squires followed the lead of the great Whig lords and bankers in accepting William III to the English throne.

The Quill and the Flute: A Parallel Survey of English Literature and Continental Music*

SABYASACHI CHATTERJEA—*Fifth Year English.*

The literature and the music of a country are parts of a single cultural system. The same social, geographic and political factors affect both. It is for this reason that a great deal of fascination is added to the study of the history of literature if one makes a parallel study of the history of music at the same time. One notices the same trends in both art forms: the slightest tremor in one finds an echo in the other. It is not my intention to try to explain why this should be so. For one thing, that would be quite impossible in a short essay of this kind. For another, that would be a dangerous thing to do (one remembers the late Mr. Shaw, in the sixth and last of his Far-fetched Fables, enjoining us to "ask what, when, where, how, who, which; but never why . .").

A parallel study of a country's literature and music is rendered easy when both the art forms are well-developed. In England, one is faced with the difficulty of two unequally developed art-forms. English music has never enjoyed the abundance of talent that has come by the way of English literature. In general, however, I have been able to confine myself to English

* A Paper read at a meeting of the Calcutta University English Seminar.

composers while ilustrating my points. It is only in my valuations of Renascent and Romantic music that I have sought illustrations elsewhere. And that has been possible because the Renascent and the Romantic festivals were widespread, continental phenomena.

* * * * * *

English literature had its origin in the minstrelsy of the early court-singers. But their music, unlike their poems, has not been put down in writing. If the Anglo-Saxon minstrels did dabble with musical notation, we know nothing of it as yet. Hence, if one desires to trace back common trends in the literature and music of England, one has perforce to stop in post-Norman times..

The earliest English critic and composer of any distinction is Walter Odington, who lived at the end of the 13th century. It was about this time that the cult of Romantic love, of love par amours,—a cult that aped the cults of Chivalry and the Church came to establish itself in the literature of England. European culture was then stirring with a new life. The Crusades had brought a spirit of awakening. Nations had come into closer contact, and cultural impulses had come to transcend national frontiers. In France, the music of Guillaume de Machault, poet and composer, served as a connecting link between the new spirit of the troubadours and the old one of the archaic contrapuntists. And in England, in the triumphant compromise of Geoffrey Chaucer, modern English poetry was born.

With the beginning of the Renascence, there was an intense activity in the field of continental music: in Italy, in the grave madrigals of Palestrina, and in the Netherlands, in the individualism of J. Arcadelt, Clemens non Papa,* and Orlando di Lasso. Across the waters, the same inspiration was moving the Elizabethan sonneteers and dramatists. Spenser, Drayton, Sidney, and Daniel were creating a literary tradition; Tamburlaine was roaring his periods in immortal vein; and the warrior-poets of Shakespeare were bringing down the quiet in a shattering ruin.

If a new literature was being created in England, a new type of music was coming to life in the large utterance of the continental composers. Like the drama, the music too was leaving the Church and Church-hymns were giving way to the more catholic madrigals. The carefree abandon of Elizabethan dramatic and sonnet poetry was ruffling the gravity of the organ-note.

The spirit of adventure and endeavour which saturates the literature of the English Renascence is noticed in Renascence music as well. With the composers, this spirit of endeavour leads to the creation of new musical forms. The madrigal was not the only innovation. It was about this time that, under the fashioning anvils of Palestrina and Frescobaldi, the Fugue was

* Meaning "Clemens not the Pope", the name by which his contemporaries called him to distinguish him from Pope Clement VII.

born, and it was about this time too that Programme Music must have been created (we find examples in the Fitzwilliam Virginal Book). Thus, while English literature was finding its drama (in Marlowe), its love-lyric (in the sonneteers), and its novel (in the early imitations of the Italian Novella and the Spanish picaresque novel), continental music was finding its proper form in the compositions of Claudio Monteverde, the great pioneer of modern harmony.

But it has to be conceded that the musical Renascence arrived much later than the Renascence in literature,—at least so far as 'form' is concerned. The spirit of the Renascence was already there in the choice of themes (Venus and Cupid and Phoebus and Philomel were common enough), but the existing Madrigals and Lute Songs were being used to express these themes. The revival of interest in Greek drama and the efflorescence of Renascence drama caused the composers to think on dramatic lines. This necessitated the emergence of a new musical form. The old contrapuntal music, as Scholes points out, could "express long-drawn moods such as joy or sorrow, but was necessarily too formal in its construction to express very rapid and dramatic changes of thought, to give point to particular words, and so on." The emergence of the Harmonic form solved this difficulty.

The controversial point is whether the changes in these two art-forms occurred quite independently of each other. Scholes seems to think they did not, and I am inclined to agree with him. My belief in this interrelation is substantiated by the presence on the Renascence scene of many figures who rank high both as poets and composers; they seem to have served as links between the two art-forms. The name of Thomas Campian, poet and composer, may be mentioned in this connection.

With the turn of the century, we see in Europe the birth of a new musical tradition, and in England, of a new poetic expression. A festival of music is inaugurated in France and Italy, and numerous musical forms are created. Alessandro Scarlatti is the founder of the 'aria' form of the Handelian opera, and of the Neapolitan school of composition. Corelli is the first classic of the violin in the forms of sonata, suite, and concerto. In England, Purcell inaugurates what is known as the Renascence of Texture.

There is, at this time, a Renascence of Texture in English literature too. The 'alembicated metaphysicalities' of Donne, Vaughan, and Andrew Marvell create a new texture. And it is significant that behind all the scientific nonchalance of their poetry lurks the same religious strain that is so evident in the music of Purcell and Gibbons.

In 17th century English literature we notice two distinct and parallel trends. The chivalric chatter of the court-poets lives side by side with the religious solemnities of Milton. The Metaphysicals represent perhaps the ideal synthesis of the two, for the gay frivolity of the cavalier-lyrist is quite as much a part of metaphysical poetry as its pervasive note of mysticism and faith. And these parallel trends are noticed in contemporary music too.

The religious strain in Purcell and Orlando Gibbons is well set off by the violent delights of Corelli, Couperin, and Alessandro Scarlatti.

As we enter the 18th century, we notice quite as great a void in English poetic literature as in English musical compositions. In literature, it is prose-writers who are prominent; such prose as is written is mostly satiric and acrid in character. English music is quite remarkably prosaic too. Handel, the only notable English composer (and even he only a naturalized Englishman), is very seldom lyrical or frivolous (the Water Music Suite and the Royal Fire-works Music Suite remain exceptions to his rule).

This famine in the world of inspiration was a legacy of Restoration rationalism. Locke, in his "Essay Concerning Human Understanding", limited all experience to immediate sense-perception. Descartes held that only 'clear and distinct ideas' may be judged in regard to their truth. Their materialistic mutterings left the poets dithyrambing in the dust. William Collins had interrupted fits of insanity; Christopher Smart spent most of his life in a madhouse; Cowper and Gray wandered about in a morbid haze.

From Restoration rationalism and its aftermath, it is a glorious climb to the glittering heights of the Romantic revival. The music and literature of the Romantics make a fascinating study, if only for their arresting similarity in detail. All the different aspects of this literature—the revolutionary, the mystical, the sad, the lyrical, or the humorous—are seen in the music quite as faithfully. Beethoven's Eroica (the Heroic Symphony) or Mozart's Jupiter are as revolutionary as the heroics of Byron or Shelley; Mozart's Requiem bears the mystical stamp of a Wordsworth; Hector Berlioz and Johannes Brahms (notably, in his Tragic Overture) are as sad as the saddest of the Romantic poets; the airy flights of Schumann and Schubert and Mendelssohn resemble the lyrical rhapsodies of Keats and Shelley; F. J. Haydn's Military Symphony and Mozart's Magic Flute Overture are spangled with passages of humour; Chopin's Revolutionary Étude and Polonaise Militaire ring with the ocean-voice of the patriot-poets; Schubert's Tragic Symphony vibrates with the futile grandeur of a Hyperion.

Just as the romantic movement in literature led to numerous changes in poetic form, in music it led to the perfection of numerous musical forms. C. W. Gluck came as the reformer of the opera and the first classic of essentially dramatic music. K. P. E. Bach was the principal pioneer of the sonata style, which was later brought to its perfection by Domenico Scarlatti, a famous son of a famous father. The sonatas of K. P. E. Bach often approached what is now known as the symphony, and it was his experimentation which doubtless led to the creation of the symphonic form and to the tempestuous utterance of Haydn, Mozart, and Beethoven.

At the same time, the "revivalistic" aspect of the Romantic movement was common to both literature and music. In literature it meant a comeback to the spirit and ardour of the Renascence: in music it led to the refinement of established musical forms. The Opera had already been created (by J. B.

Lulli), and Couperin had given us what is known as programme music. The romantic composers perfected these forms and revived established ones. The counterpoint flared up in Cherubini and Haydn, the Oratorio in Haydn and Beethoven, the Aria in Weber and Boccherini, and the Cantata in Beethoven and Weber. Much of this was old religious music revived successfully by the Romantics.

The same pattern is followed in the Victorian age, if on a less glorious scale. Sir Arthur Sullivan gives us light humour, which finds its literary parallel in the occasional capering antics of the Victorian novelist. The religious element in Victorian literature (which finds its fullest expression in Robert Browning and in Gerard Manley Hopkins) has its musical counterpart in the Church music of H. H. Pierson and August Mann. And like Tennyson, Arnold, and the Pre-Raphaelites, there are composers and writers of symphonic music whom the Victorian spirit of frustration caused, in the words of G. K. Chesterton, to 'botanize in the swamp'. In this connexion, the names of Sir Hubert Parry, Sir Charles Villiers Stanford, and Sir Alexander Mackenzie come foremost to mind. Here was talent wasted indeed!

With the turn of the century, the Englishman came face to face with a social problem which had been gathering head for quite some time. The question was a many-pronged one: it involved the foundations of social morality and the basis of the class system,—the very roots, so to speak, of all accepted things. The English mind became prepossessed with this bloodless revolution, and this prepossession sought to express itself as best as it could. The drama was perhaps the first medium to be used. Shaw, Galsworthy, and the Manchester dramatists, among others,came to the forefront, and it was when these were shouting their loudest that Benjamin Britten's Pianoforte and Violin Concertos joined in with their reformatory vehemence.

As the confused uproar of the Reformists gradually calmed down, the first World War entered as a new and powerful factor. The reformers became thoughtful and soul-searching, and as their utterings gradually took shape, several common characteristics came to reveal themselves in post-war music and literature. Some of it, of course, was merely concerned with the horror of the war-machine. Owen, Sassoon, and the war-poets joined voices with the turbulent music of the English composers, of whom Gustav Holst was the most vociferous. Holst's "Dirge for Two Veterans", set for male voices, brass, and drums, was composed immediately after the outbreak of the first World War. His "Ode to Death", for chorus and orchestra, was dedicated to the memory of the young composer Cecil Coles and other friends killed in action.

Less violent than the war-poets and the war-composers were the war-mystics. One might be excused for calling their mysticism a war-mysticism. The bloodless war had generated it, and the war of nations had brought it to a point. As the reformers fell back exhausted, they retired more and more into themselves, and out of their urge to find out some new solution,

a mysticism was born. In poetry, Eliot became perhaps its foremost exponent. He was not content with wailing the crumbling fate of the London bridge; he came to acquire a religio-mystical faith. Among the composers, one notices in the early music of Ralph Vaughan Williams a Whitmanish semi-mystical aspiration (witness "Towards the Unknown Region") which later matures (in "Tallis Fantasia") into metaphysical mysticism of the Herbert stamp. In Gustav Holst's "Hymn of Jesus" one notices effects of blinding mystical revelation. 'Mysticism in music', says Gerald Abraham, 'is commonly a luscious emotionalism'. But the mysticism of Holst was the austere mysticism of the metaphysicals. To Tovey, his 'words seemed to shine in the light and depth of a vast atmosphere created by the music'. And this mysticism of Holst, like that of Eliot, sought its inspiration at times in Sanskrit philosophy. One has only to look at his three-act opera "Sita", his symphonic poem "Indra", his nine solo Hymns from the Rig Veda, and the little chamber opera "Savitri". The last, with a female chorus vocalizing in a single vowel, has a pronouncedly oriental flavour.

Apart from the reformist-turned-mystic, there was the reformist turned cynic-satirist too. In Auden, long-asleep English verse-satire was born again, and in the shattering satire of Britten's "Our Hunting Fathers", satire-music came to make history.

The overtone of all these poets and composers was one of a vigorous masculinity. That has been the trend in twentieth-century literature and music,—the 'strong loneliness' of Ezra Pound and the "Pomp and Circumstance" of Edward Elgar. It is an anti-romantic masculinity, repelling the very suspicion of lyrical utterance. It is a masculinity which cherishes Milton and Donne and Hopkins and rejects the pale whispers of the Pre-Raphaelites. But one might very well ask, with Robin Hull, the pertinent question, 'What now'? Is the trend still the same?

The question is a difficult one to answer, as, until a definite perspective emerges, opinions will continue to be sharply divided. One does indeed notice signs of a comeback to romance. While poets like J. C. Grant and Ropert Conquest continue springing up in increasing numbers, composers like Howard Ferguson and Michael Tippet claim more and more of our attention.

Sceptics like Sir Thomas Beecham are inclined to scoff at the ultra-moderns. Modern music, says this famous conductor, is a 'continuous succession of promissory notes; composers are always promising, but only keep on promising'. Let us hope that, in time, this promise of the moderns will blossom out into a wholesome maturity, or that, from the distance of a decade, one will see genius where one now sees none. Each art has its own medium: the painter his pigments, the musician his sounds, and the writer, words. But whatever the medium, the impression left on it by movements of history will be much the same. The hinterland of modern thought will mould its music in much the same way as it continues to mould its literature.

Hamlet and Ophelia

DR. SRIKUMAR BANERJEE

[Dr. Srikumar Banerjee's retirement from this College in 1946 marked the end of an epoch in its distinguished history. His fine critical acumen is still a cherished memory with his former pupils, particularly with those among them who had the privilege to sit at his feet in Honours and Post-Graduate classes. But it is mostly in the field of English Romantic Poetry that they have seen his critical powers at work (this Magazine, incidentally, had the pages of several past issues graced with contributions from his pen on various aspects of English Romantic Poetry). Few have seen them at work on Shakespeare or guessed how good his contributions could have been if he had chosen to apply his brilliant mind to Shakespearean criticism. How good indeed is shown by the remarks reproduced below. They relate to the much-discussed issue of Hamlet's treatment of Ophelia in the so-called Nunnery Scene (Act III, Scene I), and are taken from a letter Dr. Banerjee wrote me several years ago from Rajsahi, where he was at the time as Head of the Department of English at the local Government College. They are so fine—I do not remember having read anything finer about the subject concerned —that I felt that they ought to be known outside the confines of a private letter. They will surely be of interest to all students of English literature. It is a great pity that Dr. Banerjee has ceased writing about English literature for many years.—T.N.S.]

* * *

The tragedy of Hamlet lies, to my mind, in that morbid emotional cast of mind which converts a particular experience into a most sombre and painful generalisation on life and allows a mother's infidelity to spoil and poison for him the very springs of sex-love. A definite knowledge (as opposed to mere suspicion) that Ophelia was being used against him as a decoy would have cut across the morbid strain, the tragic web, by supplying an all too reasonable basis for his hatred of women. He would in that case have degenerated into a jealous lover, and not retained his glory as the type and sample of the great philosopher who has allowed one great shock to unsettle for him the very foundations of the moral life..... No, Hamlet's bitterness against Ophelia bubbles forth out of the poisoned depths of his own soul and we need not assume that another stone was cast of set purpose to stir up the pestilential surface. A contrary assumption would weaken the cosmic character of that bitterness by substituting a very good personal ground. Surmises and suspicions may have played their part to provide the great outburst, but I would rule out a positive knowledge of infidelity.

Ophelia's own conduct also supplied a contributory cause, because I think her speeches were all tuned down to the ordinary, conventional level, the petty misunderstandings and lovers' quarrels that had nothing in common with the central fire raging in Hamlet's heart. While he was standing on the brink of a volcano and stretching forth agonised hands to her, she had quite

complacently taken her stand on the solid ground of common social intercourse, setting forth her lover's complaints with a simpering prettiness that must have sounded to Hamlet as rank sophistication. It was like talking about the weather to a man who has suffered a great bereavement. This difference in atmospheric pressure between the two souls must have been the immediate cause that precipitated the great storm.

"Peaceful Co-Existence"

ASOKE KUMAR CHATTERJEE—*Third Year Arts.*

I

The Great October Socialist Revolution of 1917 ended capitalist domination all over the Tsarist Russia. Over one-sixth of the earth's surface a new era of socialism was ushered in. The victory of the working class and the creation of the first working class state marked the transition of monopoly capitalism into its final phase of general disintegration. From that moment a question of overwhelming importance was posed before humanity. Could the two systems exist side by side peacefully or must they perish in perpetual strife?

The speakers of the new world order, the architects of the new civilization have always given a hopeful answer to this central question of humanity.

Peaceful co-existence of capitalism and socialism has always been the accepted principle of Soviet foreign policy. Ever since the Bolshevik Revolution of 1917, Soviet Russia has been carrying out a policy of peace and friendly relations between the nations. During the fateful twenty years between the two World Wars, it is Soviet Russia alone that championed the cause of peace, fought in the international arena against the dangers of a new war, endeavouring to secure the adoption of a policy of collective security and collective resistance to aggression. If the Western nations joined hands with Soviet Russia in the struggle for peace instead of appeasing Fascism, the great catastrophe that followed could have been prevented easily.

In the Second World War, Communist Russia fought along with Western democracies against their common enemy—Fascism. The heroic defence of motherland by the Russian people, their great sacrifices and amazing military feats created deep admiration for Soviet Russia in the minds of all people of the world. Hope was raised that from now onwards this great alliance would not break. A new era would dawn on earth by the steady growing

together and mutual co-operation of the two systems—capitalism and socialism.

But the events after the Second World War sadly frustrate this hope.

After the war, communism emerged as the most dominant force in world politics. The establishment of communist governments in Eastern European countries and the glorious success of communist revolt in China radically changed the balance of power between the two rival blocs. One-third of mankind was freed from capitalist bondage and communism was in advance in all European countries.

Moreover, there was a crisis in the colonial system. The Asian colonies, after centuries of subjection by Western imperialist powers demanded independence from foreign rule. In Indo-China, Malaya, Burma struggle for liberation began under communist leadership.

This march of communism in Europe and Asia was viewed as a grave danger to their existence by the capitalist countries. A new policy of reaction and aggression emerged in the capitalist world under the leadership of the U.S.A. An extensive plan for the re-armament of Western Europe and Japan was undertaken to check the rising tide of communism. A military bloc of Western nations (N.A.T.O.) was formed to resist communist aggression. A feverish war propaganda against the communist world was unleashed from the capitalist press.

II

All the Western moves for re-armament and creation of aggressive military blocks are based on this assumption that a war with Soviet Russia is imminent and inevitable. The Soviet move for peaceful co-existence is eyed with suspicion by the capitalist countries. They continuously carry on this propaganda that Soviet Russia does not sincerely believe in the theory of peaceful co-existence with other non-communist nations. Her ulterior motive is to expand her frontiers by instigating revolutions in other Western countries. The suspicion and fear of the capitalist countries are beautifully expressed in the following lines, "The Soviet policy of peaceful co-existence is only the degree of tolerance a cat offers a mouse when it has temporarily vanished down its hole. When instability and disorder reappear, Communist revolutionary pressure reappears with it. When the mouse ventures out again, the paw descends. The underlying determination to cat the mouse is absolutely unchanging."—*Policy For the West*—Barbara Ward.

But do Communists really want to impose socialism by war on the capitalist countries? The spokesmen of the Communist World have always given a different answer.

Communists have always taught that socialism cannot be imposed from above or from outside, but must be established by working people in each individual country. In the final stage of the decay and disruption of

capitalism, the working class would spontaneously rise in revolt and establish a dictatorship of the proletariat by overthrowing the capitalist class. But until the internal conditions of a country are ripe enough for a socialist revolt any attempt to enforce socialism on a country from outside would merely strengthen the capitalist class. Stalin declared in 1936, "We Marxists believe that a revolution will take place in other countries. But it will take place only when the revolutionaries in those countries think it possible or necessary. The export of revolution is nonsense."

Hence Soviet foreign policy is directed not towards 'export of socialism' but towards peaceful competition between the capitalist and socialist systems. It is the ardent belief of the Marxists that in this peaceful competition, the socialist system would triumph for it does not contain within itself the seeds of its destruction. The U.S.S.R. needs no war to establish socialism all over the world because in the competition between the two world systems it is socialism that is winning every day for it is so superior to the capitalist system. Every day of existence of socialism and people's democracy, each one of the brilliant achievements in building socialism sharpens the contrast between the life and perspectives of the working people in two parts of the world.

Thus the Marxists do not seek to win socialism through a global atomic war. They seek to establish socialism through peace and set before the world the perspective of achieving worldwide socialism without provoking a third world war.

III

The idea of peaceful co-existence of capitalism and socialism is not today a utopian dream. It has become a practical possibility.

The Western drive towards rearmament and preparations for a new world war have caused bitterness and frustration in the minds of all progressive thinkers who have watched with grim horror the two fateful world wars. Already the sober minded politicians in European and other capitalist countries who are not blinded by anti-Soviet enmity distinctly see the abyss into which the reckless American imperialists are driving them in.

In view of the growing danger of war a popular movement in defence of peace is fast developing, anti-war coalitions are being formed to ease international tension and avert a third world war. People's desire for peace has been manifested in world-wide peace movements under the leadership of World Peace Council. The fact that 500 million people signed the Appeal for a Pact of Peace between the Five Great Powers is the proof of the colossal dimension of the people's democratic movement in defence of peace.

However desperate be the imperialists' drive for war, they cannot by themselves prepare or carry out such a war. A large-scale war is impossible

without people's consent and their active co-operation. But the strength of the working class, of the forces for peace have reached today a stage, when, if they stand united and plunge into the struggle for peace, a third world war can be prevented.

Moreover, the rivalry and contradictions among the capitalist countries are indirectly strengthening the forces of peace. The more the imperialist America tries to exploit her allies by penetrating into their economies and capturing their markets, the more the antagonism between U.S.A. and her satellite countries becomes acute. Britain, France and other capitalist allies of America are trying today to break away from their subjection to the United States in order to win independent positions in the world. The prospect of living peacefully with communist nations, the possibility of rejuvenating their economies by unhampered trade with communist countries open up before them new vistas of hope. These divisions indirectly assist the fight for peace, detaching from the camp of war whole capitalist states and sections of the capitalist class in every capitalist state.

U.S.A. is today finding herself more and more isolated in world politics. The peaceful settlement of Indo-China war has shattered her hope of internationalizing the war under the pretext of fighting communism. The French rejection of E.D.C. has been a major setback to her policy of re-arming Fascist Germany. The refusal of all progressive countries of Asia to join the American sponsored S.E.A.T.O. has once again proved that the majority of human race is today sternly opposed to any policy of engineering another war.

IV

A third world war cannot be prevented by pious wishes of millions. In order to preserve peace, people must fight for it. The achievement of peaceful co-existence depends on a broad, united movement for peace in all countries. As Malenkov has put in his 'Report to the 19th Party Congress'—

"Peaceful co-existence and co-operation of capitalism and communism are quite possible, provided there is a mutual desire to co-operate, readiness to carry out commitment and adherence to the principle of equal rights and non-interference in the internal affairs of other states." In order to lessen international tension and restore a spirit of safety and goodwill on earth the following conditions require urgently to be fulfilled:

(*a*) Unconditional prohibition of the atomic and other weapons of mass destruction and immediate measures to control their use by international authority.

(*b*) Prohibition of war propaganda in Western countries in conformity with the principles of United Nation's Charter (Soviet Russia has banned war propaganda as a heinous crime against humanity. The Supreme Soviet of the U.S.S.R. on March 12, 1951 passed the famous Peace Defence Law).

(*c*) Steady reduction of armed forces by the Five Great Powers.

(*d*) Abolition of military, naval and air bases of one state on another's territories.

(*e*) Conclusion of a Pact of Peace between the Great Powers.

(*f*) Establishment of normal trade relationship between all countries.

V

The recent trend of world events—the Geneva Settlement, the Sino-Indian Peace Treaty, the Nehru-Chou Declaration of Peace are concrete examples of the effort of humanity to maintain a lasting peace on earth.

A third world war between capitalism and socialism is today a remote possibility. The likelihood of the terrors of modern warfare would act as a deterrent to aggression. Behind a modern thermo-nuclear war loom the unknown horrors—the lingering death left by radio-activity, the monstrosities of bacteriological weapons, the permanent destruction of the earth and humanity.

"Mankind stands today on the brink of ending all wars for ever. The fight to prevent a third world war, the fight for the peaceful co-existence of the two systems is the key link in the chain towards the organization of human society in a way that will make all wars a thing of the past."

('The Peaceful Co-existence of Capitalism and Socialism' by James Klugman in Modern Quarterly, Spring, 1952).

The Crisis of Britain and the British Empire

BENOY CHOWDHURI—*Sixth Year Arts.*

"No one can be certain of anything in this age of flux and change. Decaying standards of life at a time when our command over the production of material satisfaction is the greatest ever . . . . are sufficient to indicate an underlying contradiction in every department of our economy. No plans will work for certain in such an epoch . . . ." Thus Keynes, an oracle of the economic theories of declining capitalism testifies to the stagnation that crept over the bourgeois economy and certainly to the failure of the methods he and other bourgeois economists suggested to remove the instability of the capitalist system. Very much akin in spirit is the Churchillian theme of "terrible twentieth century". Yes, unbearably terrible are the issues of the century to the tory stalwart who tries to trace all the defects to the original sin of the century—Communism. The deeper the crisis, the more spiritual the language. Thus Communism is said to be a challenge to the "Western way of life", "Western spiritual values", "Christian heritage". And once Communism is driven to the wall the millennium is sure to come. Down with our knowledge of history! the spirits of Plato, Aquinas, Shakespeare and Rousseau are the inspirers of the Stock Exchanges of London and New York! Civilisation blesses the dropping of atom bombs!

But one thing is certain these glib talks do not ring with the same confidence that kept no ambiguity in the utterances of a Disraeli or a Chamberlain. If the crisis of the "Western civilisation" as a whole is deepening, the crisis of Britain surpasses all in magniture and depth. Not only that the clayfeet of the giant are seen, but they are crippled and the giant is stumbling to the ground.

Rajani Palme Dutt in this book under discussion explains this crisis. The main theme of the book is to connect the crisis of Britain with the parasitic imperial system. These twin themes cannot be seen apart in any case. In introducing this book, we shall try to acquaint the reader with the outlines of this rather perplexing theme as it is treated in the book.

---

* R. P.Dutt's "The Crisis of Britain and the British Empire" is a fitting sequel to his 'India Today'. It helps one to understand the British imperialist system and the present economic crisis in Britain better. The book also deals with the situation arising in India after 1947 at some length. It is, therefore, important from the narrowly Indian point of view. We consider it appropriate to publish a not-too-lengthy discussion of this book in our magazine.—*Editor.*

The growth of British Empire sums up in general the development of capitalism; and the colonial system of Britain developed mainly in connection with the growth of capitalism at each stage. The economic system before the Industrial Revolution could not do without the colonies,—an infinite source of wealth through the importation of precious metals and colonial products and it was the basis for "primitive accumulation" of capital. Then the world monopoly of Britain called for a change in relation to the colonies; now the colonies served as sources of raw materials and markets for British goods. England ruled over the world with its machine and the unchallenged economic power tended to dismiss the colonial system as an extravagance. Thus Disraeli styled "the wretched colonies as "a millstone round our necks." But the whole thing proved to be a nailed-up drama with the great depression of the 70's of last century when the capitalist system pushed new rivals of Britain into the foreground. The U.S.A. and Germany rivalled Britain's position. But huge accumulation of capital coupled with the rivalry in the industrial field effected the transition from the era of industrial capital to the era of finance capital. More disturbing problem to wrestle with was the growing working class menace and the Empire was an alternative to Socialism. Chamberlain said in 1895 "the policy of the Government will be to develop the resources of such colonies to the full extent and it is only in such a policy of development that I can see any solution of those great social problems by which we are surrounded." This still remains the secret of modern Tory imperialist 'democracy'.

What is the official version of the fact of existence of the British Empire and the crisis that threatens to engulf it? Obviously, there can be no consistency; since the falsity peeps out though it is decked out in various fashions. Not rare is the open contradiction between official statements. Thus Attlee's view that "imperialism . . . it is certainly not to be found in the British Commonwealth" is contradicted by Churchill's: "the British Empire—or the Commonwealth of nations we keep trade labels to suit all tastes." Still there are several themes—reiterated ad nauseam—though these are more apologetics than serious arguments. Thus it is said that there is no imperialism though under the spell of this sweet phrase, these stalwarts do not forget to vote additional expenses for overseas military commitments. Then there is a retreat from it and it is said though there is an Empire, there is no exploitation. The degrading poverty and illiteracy of the colonial people speak volumes for the "non-existence" of this exploitation. Then the hypocritic cant of "civilising mission" is certainly no less well-intentioned (?).

Similar is the official glossing over the fact of Britain's thwarted development as a result of imperialism. There has been a talk of "peaceful socialism" in England. The ruling class is not tired of talking about "nationalisation"; though it covers only a limited sector of the economy: these measures have not changed the basic character of capitalist class ownership and the fact is that the measure is often taken to salvage bankrupt capitalist industries (for

example, the railways, before nationalisation, showed a loss of £59·5 million). This so-called nationalisation did not stop concentration of wealth in fewer hands. Another propaganda—possibly election propaganda to dish the rival party—is the talk of social revolution by redistribution of national income, of course without any basis in fact. The myth of extension of social services at the cost of the rich is exploded by the official report of the Marshall Plan Administration. This report showed that the social service amounted to 57*s.* a week, while the current taxation paid by a working-class family amounted to 67·8*s.* a week.

So official propaganda about the Empire and internal bankruptcy is sheer propaganda. Nothing more, nothing less. We find Britain heading towards a crisis.

What are the outward signs of this crisis? Internally, the net deficit in the balance of payments continues to increase like a rolling snowball. In 1951, import surplus soared to a total of £779. Then agriculture and industry also are hit. Thus between 1871-5 and 1939 the arable area of Britain showed a drop of one-third. Britain, once the foremost industrialist country, lags behind other countries especially the U.S.A. regarding technical advance. Then the dollar crisis stares Britain in the face. Bartering away of national sovereignty of Britain coupled with hysterical armament-drive points to some inevitable crisis.

The ruling class has its own explanation of the crisis. It never thinks the Empire as a Damnosa Hereditas. Only some external "world forces"—world wars, world economic crisis, changing terms of trade, American or German competition, Russian Communism—are talked of as explanations. In the same way after the first world war, economic anarchy was attributed to war, but the depression of the 1930-'31 caught the ruling class completely unawares. The Second Labour Government's persistent boasting about a return to the normal *behaviour of economic force* proved an obstinate folly. Certainly the war has its share in the post-war unsettlement of Britain but that was only a helping factor, not the sole one. The Soviet Union and the People's democracies *of Eastern Europe* have shown striking recovery from the evils of war, and these countries were the hardest hit. But the important consideration here is that Britain was showing the symptoms of the crisis much earlier and war cannot be turned into a scapegoat. Thus the deficit in the balance of payments reached the considerable figure of £70 million in 1938.

The what are the causes of this horrible crisis?

Firstly, in the words of the author "the essence of the truth of Britain's crisis is that it is the crisis of the parasitic metropolis of a world empire; that the whole economic and social structure of Britain has been built on this assumption of empire; that this basis of empire is now beginning to crack and therefore the whole traditional economic and social basis in Britain is plunged into increasing difficulties . . . . ."

In the era of imperialism, Britain counted solely upon the colonial tributes to balance its accounts. A net import surplus had become characteristic of British trade. "By 1913, the proportion of imports no longer paid for by exports had reached 38 p.c. and by 1938, 40 p.c." In the words of Schulze-Gavernitz quoted by Lenin in "Imperialism"—"Great Britain is gradually becoming transformed from an industrial State into a creditor State" and Lenin comments *"the rentier State is a State of parasitic decaying* capitalism." This crisis was sharpened by other two factors. Since in the interest of finance-capital drawing its super profits" from the colony with assuredly less trouble, agriculture and industry in the homeland were neglected, the result was technological backwardness and stagnation. Then as a result, to quote the author "Britain's proportion of world manufactures fell from one-third in 1870 to one-fifth in 1913 and one-tenth in 1938 and of world exports of manufactures from two-fifths in 1870 to one-tenth in 1938." So it is quite natural that the colonial tribute was absorbed to meet the increasing imports surplus, leaving nothing for the export of capital to maintain and develop the overseas capital accumulation. Hence the vicious circle.

Secondly, national upsurge in the colonies is all the more frightening. And the changing character of national movement seeks to drive a nail in the Empire's coffin. Bourgeois nationalism is gradually being transformed into proletarian nationalism with its slogan of international unity of the workers. The result is that essential tie-up with the Empire—a feature of Bourgeois nationalism is broken. With the Revolution in Russia and especially anti-Fascist movement during and after the 2nd World War, the national movement enters upon this final phase. Brutal measures to suppress the movement or the tactics of wining over the upper strata of the bourgeoisie are proving ineffective. This crisis then is intensified by the "remedy" applied to solve the crisis. England's overseas expenditure necessary for military commitments for the suppression of national movements is an additional burden on the awful deficit in the balance of payments.

Thirdly, this Colonial crisis has taken the shape of a dollar crisis now. The author traces the gradual tightening of the American hold upon Britain. The raw materials drawn from the colonies were used not to meet the home requirements, but by sale to the United States and dollar countries to provide the exchange for the purchase of dollar goods. Side by side American imperialism turned the offensive against Britain. So many economic agreements and military alliances are so many chains fastened around Britain. The Loan Agreement by the policy of "non-discrimination" nullified Britain's attempts to seek freedom from dependence on dollar supplies. The Havana Trade Agreement is a final verdict on Imperial preference. The Truman Doctrine is the assertion of American imperialist move in the Middle East. The Marshall Plan intensified the penetration by direct establishment of economic organs of control in Britain. "Point Four" Programme of

Truman is the open assertion of future American penetration in British Colonies. In September, 1949, devaluation was forced upon Britain with the basis of sterling bloc undermined. Then the author tries to explain the extent of American trade penetration in the British Colonies—Australia, Canada, Ceylon, India and Pakistan, Malaya, New Zaland and South Africa.

This economic bondage is sought to be cemented by military subjugation. Britain's participation in American-sponsored Atlantic Pact, Western European Union, Defence Organisation, Middle East Command; numerous American bases in Britain as possible jumpingoff grounds to attack Russia and the People's Democracies; carrying out at the American Mandate the three-year rearmament programme of £4,700 million all these are typical examples of Britain's submission to America. Britain is entangled in any military commentment America proposes and the burden on Britain is understandable.

The solution of this irritating problem lies in the vigorous working class movement which only can free the country from the holy alliance between English finance-capitalist class and American imperialism and then 'all relations between the peoples of the present Empire which are based on political, economic and military enslavement must be ended and replaced by relations based on full national independence and equal rights" (the British Road to Socialism, April, 1952).

Thus the book treats the most burning question of the day—crisis of Empire and growing working class movement to liquidate it. And the conclusions the author draws are backed by authentic sources. Only one word about *it* can be said. Quotations from so many newspapers should have been more limited, since newspapers reflect opinions which may not always explain or characterise a problem.

The book will be a real boon to the working class of different colonial countries. A special chapter is written on the British imperialist tactics in India after the 'independence' of 1947 and the treatment is stimulating and revealing. We recommend the book to all struggling for, and thinking about, a better and happier future.

Electoral Procedure in Our College —A Reconsideration

AMIYA KUMAR SEN—*Fifth Year Arts.*

This article seeks to examine and analyze the mode or system on the basis of which the elections to the Student' Union of the College are held with a view to focussing attention on the merits and defects of the prevalent system. The prevalent system must have great advantages otherwise this procedure would not have been adopted. However, it seems that there are many things to be said against this system also and it is on the defects rather than the merits on which emphasis should be laid so as to enable us to perfect this system.

It appears that the procedure which is adopted in the elections to the College Union is unnecessarily complicated. For the purpose of election of representatives, the students are grouped under seven different multi-member constituencies—the actual number of members to be returned varying from constituency to constituency. Anyone who is a student of the College at the time of filing of nomination papers is entitled to vote but his vote must be cast in the constituency to which he belongs. Voting is by secret ballot. Each voter has the right to cast a single vote which is transferable. Therefore he may indicate his preferences among the candidates by stating his first choice, second choice, and so on. The quota, or the number of votes required for election, is then ascertained by the formula: the number of votes cast is divided by one more than the number of representatives to be elected in the particular constituency. This is known as the "Droop quota". Any candidate who polls one vote more than the "Droop quota" is declared elected. Therefore, the actual quota which must be reached by a candidate in order to be elected is obtained by the formula:

$$Q = \frac{V}{n+1} + 1$$
$$= \text{Droop Quota} + 1$$

where Q=quota to be reached by a candidate to be declared elected
n=number of representatives to be elected in the particular constituency.
V=number of voters who have actually exercised the franchise.

First, the first choices or preferences indicated by the voters on the ballot paper would be counted. Any candidate who polls 'Q' number of

first preferences would be declared elected straightaway. Obviously, the number of candidates who poll the requisite number of first preferences would be less than the number of representatives to be elected from the particular constituency. This follows from the fact that the requisite quota is one more than the Droop quota.

Thus, a number of candidates are left in the contest with a number of first preferences which falls short of the required quota. In these cases, the votes of the candidates who have already been declared elected, on the strength of the number of first-preference votes which they have polled, are passed on to candidates not yet elected, in the order expressed in the preferences.

Now, all these second preference votes are counted. Each second preference vote has a value which is equal to $\frac{'p'}{'q'}$ times a first preference vote. That is to say,

One first preference vote $= \frac{'q'}{'p'} \times$ one second preference vote

or, 'q' second preference votes = 'p' first preference votes

where, q = the number of first preference votes polled by the candidate who is declared elected first.

and $p = q - Q$.

Thus, 'q' second preference votes $= (q - Q)$ first preference votes.

Having discovered a means by which second preference votes may be given the value of first preference votes, the number of first preference votes polled originally by these candidates are added to the number of first preference votes thus calculated. If a candidate now reaches quota 'Q' then he is declared elected. But if the number of seats in the constituency are not filled up by this method, then the candidate who has polled the lowest number of first preference votes must withdraw from the election and his second preference votes, if any, are passed on to candidates not yet elected, in the order expressed in the preferences and for this purpose, each second preference vote has the value of a single first preference vote. If any candidate now reaches the required quota, he is declared elected.

If a number of seats still remain vacant, then the above methods are repeated with the third preference votes, till the required number of representatives are elected from the particular constituency. If vacancies still remain to be filled up, the Principal of the College has the right to nominate the required number of representatives from that particular constituency.

Such is the complicated electoral procedure in the College. Such a system must suffer from inherent defects and to these we now turn. First, one may ask the pertinent question as to why we should continue to retain this system of single transferable vote? The method of single transferable vote is known as the Hare system because it was formulated by Mr. Thomas Hare

in 1859. Mr. Hare proposed this system in order to ensure proportional representation. In democracy it is conceivable that the wishes of a minority consisting of almost half the entire electorate, might be completely disregarded. To prevent this possible tyranny of the majority, Mr. Hare proposed a system of minority representation which came to be known as the Hare system of proportional representation. It is true that in a democracy the minorities must yield to the majority decision. But that does not mean that they are not to be heard at all, or that they are not to be given a representation proportionate to their number. Where the minorities are not properly represented, the powers of the Government are exercised by the majority of the legislative body which in turn represents the majority of the people. Thus the majority of the majority may be, and often are, but a minority of the whole. In defence of existing constituencies it may be said that if a party is a minority in one place, it is a majority in another and, on the whole, every shade of opinion which exists in the country obtains a fair share of representation.

Modern party system has produced another evil. Had there been no opposition to a party, it might have selected the best candidates from moral, intellectual and social points of view and voters would also have voted more dispassionately. But under modern party system, the best candidates are not set up unless they give an undertaking to follow the party direction blindly. The followers of a party in the country also vote blindly, lest their opponents should be elected. The Hare system sought a remedy for all these evils. Under this system, the whole country is to be regarded as one constituency and many representatives are to be elected from this constituency. Applied to this College, it would mean that 38 representatives were to be elected from one constituency *i.e.*, the College as a whole and it would necessitate the indication of nearly as many preferences on the ballot paper! If this is not practicable, then it would be better to have as few constituencies as possible but each constituency must be a multi-member constituency. In all these respects, our College system closely resembles the Hare system.

But the essence of the Hare system lies in minority representation by the single transferable vote system. In this College, the elections are not fought on party-basis. Until the party-system develops greatly, it would not be necessary to retain the single transferable vote system. The Hare system allows a voter to vote for any candidate whom he deems fit to represent his interests. This candidate may be seeking election from a constituency to which the voter does not belong. But this method enables the minority to pool its votes from different constituencies and cast them in favour of one particular candidate. Thus the minority may cast its votes in favour of able candidates who are seeking election from other constituencies where they are strong instead of in favour of an incompetent candidate in the same constituency to which the voters belong. The minority, thus, prevents its votes from being wasted on a candidate who cannot be elected. This ensures minority representation by

the Hare system. In this College, this system is disallowed and hence the prevalent system robs the single transferable vote of its basic value.

There is also a considerable amount of chance in the system of single transferable vote. There have been cases in the past of candidates failing to get themselves elected in spite of the fact that they were only one short of the quota because they did not poll sufficient number of second preference votes to compensate for the shortage of one first preference vote. Such cases are unfortunate. The element of chance has been sought to be avoided in the College by considering all the second preferenee votes cast in favour of the candidate who is declared elected on the strength of his first preference votes. The Hare system only considers the surplus votes of the candidate who is thus elected and his surplus votes are passed on to candidates not yet elected, in the order expressed in the preference. These second preference votes in the Hare system have a value equal to that of a first preference vote. Obviously, therefore, there is a considerable amount of chance in the order in which the ballots are counted.

But the College system, which we may henceforth call the 'Presidencian system' suffers from the same defect in another way.

If the number of seats in the constituency are not filled up in spite of counting the second preference votes and in spite of imputing to them a value which is equal to $\frac{'p'}{'q'}$ times a first preference vote, then the name of the candidate who has polled the lowest number of first preference votes is struck off and his second preference votes are passed on to the candidates not yet elected in the order expressed in the preferences. This is grave injustice perpetrated on the particular candidate and strong objection should be taken. For all we know, he might have polled all the third preference votes in his favour and thus might have been elected. So there is no valid reason for cancelling his name from the list of contestants. Apart from this, when his name is cancelled and his second preference votes have been passed on to the other candidates in the order expressed in the preferences, there is no reason why these votes should be imputed the value of a first preference vote. This means that a second preference vote and a first preference vote exercised by the same voter may, for all intents and purposes, be given equal value. This is not true at all as the voter has definitely expressed his preferences on the ballot paper and after that no one has the right to alter the value of those second preferences which have been expressed by the voters.

Further, there is no basis for imputing to the second preference votes in other cases the value of $\frac{p}{q}$ times a first preference vote because the ratio in an arbitrary one. Every one is free to express the value of a second preference vote in his own way—for example why is it not $\frac{p+1}{q}$ or $\frac{p+2}{q}$ times

a first preference vote? There is no answer to these questions. Students of economics will readily recognize that the same difficulties which face the acceptance of the ordinal system of measurement are also present here. For instance, the attempt to find out a ratio between the value of a first preference vote and a second preference vote is nothing but a futile attempt to find out a marginal rate of substitution between the two types of preferences. These methods are dangerous when applied in a theoretical analysis and still more dangerous when they are applied in the practical field. The use of the ordinal method of measurement is to be deplored by all means in these cases. But these defects are all of secondary importance.

As has been pointed out before, the fundamental objection is that there is no minority party of which we can talk and therefore there is no need for the application of the Hare system of the single transferable vote. Every candidate stands for himself. It is for this reason that one does not see the necessity of retaining the single transferable vote system any longer in this College. My argument may thus be summed up in the form of a question: What are the basic reasons for retaining the system of the single transferable vote?

The Alternative

Students of this College may well ask the question, "What is the alternative to the prevalent system?" A suggestion has been made to introduce an extremely simple system which is already in vogue in other places. This system has been adopted by the University of Calcutta for conducting elections to the Academic Council from the Registered Graduates' constituency. This system retains much of the old form and yet is an improvement on the present procedure. The only difference is that the single transferable vote is not used for the purpose of elections and it is replaced by a system of plural voting. Thus, the principle of plural voting is combined with the principle of multi-member constituencies in this system.

According to this plan, each voter will be entitled to cast as many votes as there are seats in the particular constituency. He may or may not cast all his votes. Each vote has the value which is equal to that of a first preference vote in the single transferable vote system. The only restriction on the voter is that he cannot cast more than one vote in favour of one candidate and it is only fair that this restriction should be imposed on each voter to prevent "cumulative voting" by which all the votes may be cast in favour of one candidate.

Counting will, consequently, be simpler as the Returning Officer has only to add up the number of votes that each candidate has polled in this way. The candidates who poll the highest number of votes are elected from the particular constituency. Let us take an example. Suppose there are seven candidates contesting for four seats in the constituency. The candi-

candidate who polls the highest number of votes is ranked first and the candidate who polls the lowest number of votes is ranked last and so on. The first four candidates are declared elected. The system is quite simple and is free from all the defects which are inherent in the single transferable vote system. It is a matter to which students of this College should turn their attention as soon as possible. It would be in the best interests of all concerned to have the present system of single transferable vote abolished and to have it replaced by a more suitable method.

Sleep

DR. ACHINTYA KUMAR MUKHERJEE
Department of Physiology.

"O Soft embalmer of the still mid-night!
Shutting, with careful fingers and benign,
Our gloom-pleased eyes, embower'd from the light,
Enshaded in forgetfulness divine."

—*Keats.*

Literatures of all countries are full of descriptions of Sleep—sleep, sweet sleep—Sleep, the healer—Sleep, the death of everyday's life. But what is sleep? Is it merely a transitory state which diverts the normal activity of an individual?

Scientists are unanimous in holding that the higher structures of the nervous system induce sleep, but what the sleep-process is, and whether a sleep centre (area) exists in the body are questions that have not yet been definitely solved.

While the cause is not definitely known, theories are many. A number of theories have been put forth by a large number of scientists. Some earlier theories are at present of merely historical interest. The oldest idea is that sleep is unconsciousness. It has been finally proved that sleep is never a state of consciousness; but neither is unconsciousness sleep nor sleep unconsciousness. Stimulations from inside and outside the body are carried to the brain, the highest center of the nervous system—more particularly to the cerebral cortex, the supreme controller of the nervous system. Impulses auditory, visual or tactile (touch) are generally communicated by the nerve fibres like telegraph cables and through a series of sub-stations reach the

Cerebral cortex. The earliest idea of Perion was that temporary breakdown of the continuous chain of sub-stations initiates the phenomenon of sleep, but experimental evidence in favour of this hypothesis is not strong enough. The next important idea about sleep is that diminished flow of blood through the brain may produce sleep. This theory is known as Cerebral Anaemia. Supporters of this view argue that men feel sleepy after meal on account of the diversion of blood flow to the digestive organs in large quantity, causing a state of anaemia of the brain; but experimental evidence shows that a state of anaemia which may cause sleep seldom develops. It is true less blood circulation through the brain may cause a sleepy state but never true sleep. Others are of opinion that sleep is due to the production or accumulation of certain toxic or chemical substances in the brain, and lots of such substances have been considered by several scientists. But all these theories are very ill founded. It is a matter of pride that one of our Indian scientists, Diskhit, also propounded a similar theory, the "acetyl-choline theory" which although not confirmed has so many possibilities.

Klietmann has put forward a hypothesis now widely favoured that for the production of sleep absolute relaxation of the muscles is necessary and this can be achieved if one is properly tired, and that sensory stimuli should be minimised to the greatest possible extent. Failure to sleep amongst examinees after examinations though tired to the extreme and without any anxiety is well known to all of us and that a person can sleep soundly even standing without proper relaxation is known to us.

Pavlov, the great Russian scientist, proved that sleep is an inborn instinct of all animals and that this is induced without any wilful control as in children. So he said it is a Reflex mechanism but this reflex mechanism is conditioned by the individual. The night-shift worker, after a few days of night duty, can sleep in day time without any nocturnal discomfort. The conditions are the instinctive preparations for sleep, assuming a certain posture and arranging the external environment suitable for sleep. Somebody can sleep very easily with a "novel", children fall asleep in the midst of unfinished songs or stories, and the environmental state produces an inhibitory or negative excitability which gradually spreads to the different compartments of cerebral cortex and to the sub-stations of the cerebral cortex and produces a state of of general cessation of the function of cerebral cortex and during waking this negative wave again recedes and thus we experience gradual loss and regaining of sensations of various types at the onset of sleep and before waking.

It is quite true that for the initiation and production of sleep the mind plays a major role. A prolonged period of wakefulness or failure of sleep after retiring is known as insomnia. In the majority of cases emotional disturbances are responsible for insomnia, but certain acute or chronic organic disturbances also may cause insomnia. A simple diagram may be sufficient to explain the various causes of insomnia.

Recently it has been thought that in one of the cerebral cortex sub-stations of the brain, *viz.*, hypothalamus—there are two areas, one for sleeping and another for waking. How hypothalamus acts in the initiation of sleep is not yet explained. Whether it is controlled by its master, cerebral cortex, or it controls its master like a faithful and wise minister is yet unknown.

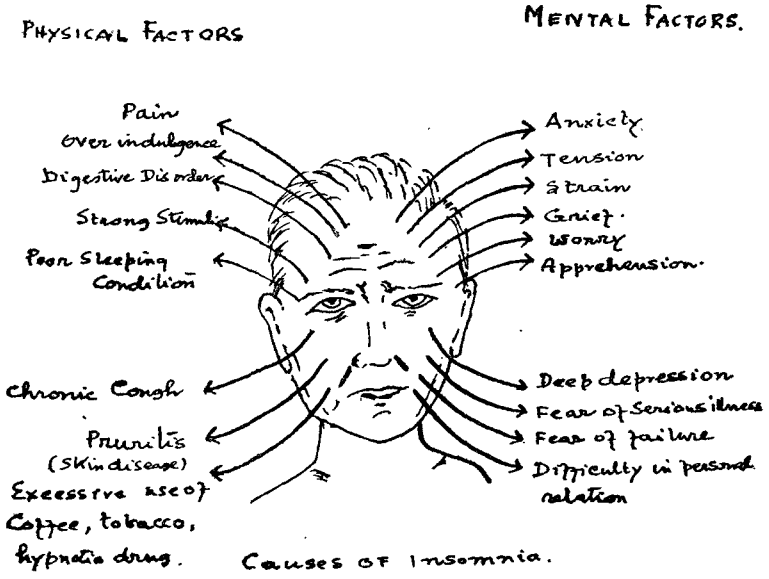

Causes of Insomnia.

Now we are in a position to understand something about sleep. Is sleep essential for life? The question is even to-day unanswered. Experiment and evidence lead us to think that sleep is necessary but not essential for life. Sleeplessness never kills but the mental condition due to prolonged insomnia may lead to death.

Oscar Wilde and His Stories

DIBYENDRANATH SEN GUPTA—*Third Year Arts.*

Oscar Wilde flashed into prominence towards the end of the nineteenth century and in a few brief and brilliant years of his literary career, marked a place for himself not only amongst his contemporaries but also in the English literature for all time. Like Sheridan and Bernard Shaw, he was Irish by birth and was no less sparkling as a playwright. Although his fame rests primarily on his plays, he tried his hand at essays, novels and short-stories, and with considerable success. His power and brilliance as a writer has never been questioned, although some people have refused to include him among the top ranking few. Charges have been levelled against him, and that on undeniably rational grounds. But, while it cannot be disputed that many of his detractors are quite reasonable in their denigration of Oscar Wilde, he has many rare qualities, which can never escape the notice of a discerning and sensitive reader.

Accusations have ben made against Wilde that he had an unnecessarily cynical attitude towards Society and its conventions. Perhaps the indictment is not altogether unfounded and Wilde's cynicism cannot be fully justified. But it is possible to a very large extent to explain his attitude towards society. With his brilliant intellect, it was not at all surprising that Wilde did see through the pretence and futility of contemporary social conventions and customs. Moreover, Wilde was a believer in what he thought to be the true "Art"—that art which was an end in itself and consisted only in the creation and appreciation of beautiful things. In his pursuit of that art Wilde never hesitated to sacrifice and override any obstructive rule of social behaviour whenever it stood in the way. He endeavoured to wring from life, in all its aspects, that elusive spirit of beauty for which the aesthete in him craved and in the process, amazed and shocked the contemporary society. It was almost inevitable that Oscar Wilde would be ultimately charged with preaching immorality through his writings. From the point of view of his accusers, the charge is not entirely groundless, though from the standpoint of an artist a lot can be said for the defence of Wilde. All that Wilde created was conceived and written, based on his own particular view of 'Art', and in such creation, Wilde took no account of the ethics of the time but drew upon materials which might popularly be termed 'right' or 'wrong', indifferently and according to his fancy like a painter choosing the colours of his palette.

The result was perhaps justified and English literature was enriched with the brilliant writing of Wilde, sparkling with wit and epigrams, possibly at

the cost of prevailing ethical ideals. Thus the very writings which consolidated Wilde's claim to fame were judged fundamentally immoral by many of the critics of his time. The foundation on which Wilde built up his fame as a writer proved to be a rather insecure foundation for his standing and repute.

Although, it is his plays that have contributed more to Wilde's fame, his plays have been said to suffer most from these alleged defects. In the dialogues of his plays we find full play given to Wilde's power of conversation, scientillating with wit and satire. In the course of such conversation, Wilde has often strayed from the theme of his plays if it can be said that he had any definite theme at all. In his plays Wilde succeeds in making masterly digs at society and incurs its rage. To make matters worse, he deliberately cries down all forms of asceticism and self-denial and thus intensifies the bitter feelings of his antagonists.

His poems and ballads reach a certain standard of perfection but suffer from a plentitude of images. As elsewhere, he ignores in his poetry the problems of morality and philosophy which troubled the Victorians. In brief poignant lines he has depicted poetical images to suit his own mood, but has failed to attain that quality which would have made him a truly great poet.

As a novelist also, he is just short of success, because he does not know life and its multifarious details well enough to depict anything profound. His famous novel 'The Picture of Dorian Gray' fades out after a bright start, leaving one in doubt if the book would not have been more effective as a short story!

Oscar Wilde is at his best in his short stories. His masterly use of words, his deft and suggestive touches in creating an atmosphere and his witticism and keen sense of humour make him a consummate short story writer. His stories can be divided into two broad categories, short stories proper and tales.

In the former category are included 'Lord Arthur Saville's Crime', 'The Sphinx Without A Secret', 'The Canterville Ghost' and the 'Model Millionaire'. The last is a perfect specimen of a humourous short story. The instant rousing of the reader's interest, the continued suspense mounting up to a fitting climax and a conclusion, all these essential qualities of a good short story are present here.

'The Sphinx Without A Secret' is a study in abnormal psychology. Here Wilde portrays the strange behaviour of the widowed heroine of the story as an expression of a 'mania for mystery' for which, however, no explanation is provided by Wilde. Wilde often chooses not to tell us why people act and we may suspect that he himself was not sure of the reason why. Or it may be that he is not interested like Chekhov or Conrad in the analysis and pursuit of motives. 'Lord Arthur Saville's Crime' and the 'Canterville Ghost', though not of the same standard as 'The Model Millionaire' or the 'Sphinx Without A Secret', also go to establish Wilde's claim to greatness as a short story writer.

Oscar Wilde's tales which form a significant part of his literary output show all his virtues and a few of his faults. The first four of his tales, 'The Young King', 'The Birthday of Infanta', 'The Fisherman And His Soul' and 'The Star Child', appeared as a collection of stories called 'A House of Pomegranates'. His other tales include 'The Happy Prince', 'The Nightingale And The Rose', 'The Selfish Giant', 'The Devoted Friend' and 'The Remarkable Rocket'.

In his tales Wilde emulates Hans Andersen, the master story-teller, to a significant extent. These tales, however, bear the unmistakable stamp of Wilde's power and originality. Each of them is short, beautiful and symbolic and the language in each is Biblical in its dignity and simplicity.

In his stories, particularly the 'Happy Prince', 'The Young King' and 'The Star Child', the smiles as well as the tears of men have been portrayed by Wilde with great mastery and these impress children and grown up alike. 'The Fisherman and his Soul' is an attempt to discover the exact relationship between man and his soul. 'The Selfish Giant' reveals Wilde's deep religious fervour and his passionate love for beauty. 'The Nightingale And The Rose' presents a contrast between the spirit of romance and beauty and the callous and casual everyday life. 'The Devoted Friend' and 'The Remarkable Rocket's are ironic comments on the inconsistencies and the incongruities of human character.

Without in any way derogating from the merits of the works of Oscar Wilde, we can discern in his writings the tendencies which led to his ultimate tragedy. The themes of most of his writings are themes of violence or passion or of unbridled sensualism under the guise of aesthetic epicureanism. Many of his writings reveal the irresponsible moods of an unstable mind dabbling in forbidden voluptuous pleasures often bordering on the perverse. 'The Picture Of Dorian Gray' and the play 'Salome' are examples of such writings.

Yet to the last, he remains a great artist and even his most dogmatic antagonist cannot deny Oscar Wilde his genius. The renowned 'De Profundis' written by Wilde in prison testifies to his unfailing artistic temperament which could rise above circumstances.

It may be that the imprisonment of Oscar Wilde put an end to his literary career and thus impoverished the English Stage and English literature to a great extent. On the other hand it may be, that by the time he was sent to prison he had himself frittered away his qualities and would in any case have ceased to produce any further works of great ability. Those who hold the latter view may say that the writings of Oscar Wilde after his imprisonment were really the result of the curative shock of punishment.

Be that as it may, we, after the lapse of so many years, can safely pardon Wilde all his infirmities and remember him at his best. We can, with the posterity, remember Oscar Wilde as the flashing genius who posed to be a dilettante.

The Valley of Paradise

SANJIB KUMAR BISWAS—*Sixth Year Science.*

"In a hundred ages I could not tell thee of the glories of Himachal"

—*Smythe.*

At the end of April last, I received an invitation from Sri S. N. Mitra, Curator, Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, to join an expedition he was arranging to the glaciers of Kanchanjanga. Being fond of mountains, I readily accepted the invitation.

On the 20th May, 1954, we had the busiest morning when thirty Sherpa porters left Darjeeling with our luggage containing provisions for thirty-five men for thirty days together with tents and equipments. Thus, the expedition began, and the Sherpas announced the auspicious moment of setting forth with their usual religious shouts. These Sherpas are wonderful people —they are born in the mountains, brought up in the mountains and mountains are part of their life. In fact, they are born mountaineers.

On the day following, the first part of our journey began with a monotonous motor trip from Darjeeling to the Singla Tea Estate. There we joined our porters to set out on the first march of the expedition. It was a most tiring and monotonous march down the hot valleys of the lower elevations— temperature was nearly one hundred degrees in the shade. Yet we were sweating. Besides, the very first march is always tiresome since it necessarily involves a change over from the quiet homelife to a life of unaccustomed strain.

Near Singla Bazaar, we entered Sikkim, crossing the river Rammam which marks the Indo-Sikkim boundary, by a well built suspension bridge. On the other side of Rammam is Naya Bazar, the Sikkim outpost and a business centre in South-West Sikkim. The tiring march ended at the Dak Bungalow of Chakung. A restful night followed after a good dinner which Nim Temba, the Sherpa Sirdar served us.

The marches which followed were still more uneventful and monotonous through the tropical and subtemperate forests, full of leeches. These leeches are the worst plague of the Sikkim valleys, especially during the rains.

On the 24th May we reached Pamionchi, a well-known place of pilgrimage for the Buddhist Tibetans. Pamionchi has a monastery and a Dak Bungalow. The Bungalow was the last of its kind to offer us a road-side shelter and represented the outpost of modern civilisation. Beyond Pamionchi we had to depend on the tents, the most faithful of portable shelters, until we reached Phalut on our return journey. We paid a short visit to the

monastery on the following morning. We were quite surprised to see the colourful frescoes and sculptures on the walls and the wooden pillars which the skilful Tibetans had worked out with painstaking labour for long, long days. Centuries have passed but these wonderful ancient paintings remain in all their glory—bright and fresh.

25th May—Drizzle and fog as usual. Unlike the previous marches, almost the whole route lies through cultivated land. A short descent to the river Ringbi crossed by a crude bridge made of cane and bamboo—an event to be remembered. A Sherpa girl with a load narrowly escaped falling into the river when the bridge swung terribly. Camped for the first time near a village hut at Tingling. Torrential rain in the evening. Tents failed to resist the blasts. Spent the night squeezing on to the smallest dry place left, completely wrapped up with water-proofs—a queer feeling.

26th May.—It was a bright morning. We marched through the cultivated hill terraces. A short descent to the Rathong river—a cane bridge to help

Cane Bridge across the foaming Rathong

Rathong Falls

us crossing. An ascent up the 'Makai' fields and bamboo forests to the top of a flat spur. It was the village Yoksum. A nice little hamlet surrounded by the high hills—south blocked by Darjeeling ridge, north by the high lands of Zongri with a bluish green clothing—silvery Rathong winds through them. Several monasteries seen, crowning the neighbouring hills. Received a cordial welcome from Kazi—the head man of the village. We became the guests of Kazi and stayed in his hut—a palace compared with others, provided with certain modern equipments such as window glasses, curtains etc., well-decorated with Tibetan carpets and vessels. Felt very much cosy after a horrible night at Tingling.

Each of us enjoyed the night in his own way. Porters enjoyed the night singing and dancing after having consumed a plentiful supply of "Toongla" (a kind of liquor, Tibetans are very fond of) from Kazi's place.

27th May—visited Duldi monastery, similar to Pamionchi. It was here that the Lamas who introduced Buddhism in Tibet met for the first time and drew up their plans for converting the people. A day's rest at Yoksum Checked up stores and accounts.

28th May.—A day to be remembered. We left Yoksum. Fairly good weather. The hospitable Kazi family, dressed ceremoniously bade us farewell. We were feeling sorry at the time of parting.

Once again we started on our expedition—an arduous venture. Leaving Yoksum behind, we moved onwards. The path lay through a land untouched by human hand. The route proceeded northward along the Rathong valley in the up stream direction up to the vast undulating pastures of Zongri at the gateway of the land of snows. The virgin sub-temperate forest full of leeches and ticks accompanied us for the next two marches—Yoksum to Zamphuk and Zamphuk to Bakhim. Beyond Bakhim everything looked better with the weather—the leeches were scarce, the forest was getting thinner as we got higher and higher up until we reached the thick rain forest, blooming with Rhododendrons and conifers.

We pitched our first base camp at Zongri near the snows surrounded by the great peaks of Kanchanjungha range. There we took a day's rest before starting for the glaciers. That day I attempted the rock peak Kaloor (16,000 ft.), standing fanastically with its barren tops pointing sharply into the sky. like the minar of a Mosque. After a hard struggle for six hours I was able to climb it.

Four of us with eighteen strong porters and a few essential goods for high altitude started for Gocha La. The route followed a tributary of Rathong—headwards to the north up to the snout of its glacier at Onglakthong, the last limit of vegetation. There was a storm and everything was covered up with mist when we camped at Onglakthong. The 2nd June was a bright morning and we could get, after the mist had cleared away, a view of the country we were in. We were surprised to find ourselves in the mystic land of white giants. We were on the slopes below Jubonn which continued to the north in a long ridge to terminate against Pandim. Prek emerged out of a huge glacier, the Onglakthong glacier. The head of the valley was crowned with the immense white massif of the majestic Kanchanjungha standing high against the intense blue of the sky. We walked through nature's rock garden—there were the brownish turfs of the pastures, rocks torn by the frost—bare and rugged silvery waters flowing in their own whimsical way raising a soft careless musical murmur.

We pitched our highest camp among the shaggy boulders on the bank of a dried up lake. The boulders sheltered us from the strong wind sweeping along the Onglakthong valley. The Sherpas called that place Chemathang (15,500 ft.). The landscape was shrouded with thick mist and it was bitterly cold. We immediately entered into the sleeping bags, and we felt fully comfortable only after taking a hot cup of tea.

The 3rd June dawned with the brightest weather that we ever had in this expedition, the panorama was clearly visible. It was about 5 o' clock in the morning when I woke up. I tried to get out of the tent but the flaps appeared very heavy. It was snowing all night. The trickling streamlet in front of the tent had stopped flowing and had hardened into a massive white, the water in the bucket had become a solid block of ice, the roofs of the tents were lower due to the weight of the snows. The ropes, the pegs and poles, the boxes, the grass and shrubs, the boulders, all were white wherever I looked. It was pure white—the emblem of eternal peace. The sun had not yet risen, a grey light dominated the atmosphere. It was only dawn. The sky was just turning blue and against that stood the lofty white giants all around me—the gigantic white figures looked like solemn "Yogis"—mute and motionless. I was lost in that puja that "Prakriti", Nature, was offering to "Purusha", her Lord. There stood the mightiest Kanchanjungha, the Lord of Paradise. Was this the Paradise of which we ignorant people talked so much? I felt sure if there was any heaven anywhere, it was in this very heart of nature.

The mighty peaks seen from Darjeeling were so near that I could hardly recognise them at first. To the east ahead of us, the vast icy slope of Pandim

Clouds over the Pandim Peak (22010 ft.)

Pandim Peak at dusk

(22,010 ft.) swept up in a perfect curve to end in a perfect point, sunlit and infinitely beautiful against a pool of blue. On the west were the mighty ranges of Kalru (24,017 ft.) and in the centre, the north was blocked by the towering Kanchanjungha (28,168 ft.) standing majestically with the white triangle of Talung (23,081 ft.) in front of which Gocha La (Tib. la=pass) saddle bridges up the Kalru and Pandim ranges. Kanchanjungha, the King of the 5 peaks, stood there in that Durbar hall of the kingdom of snows with his five ministers,—Kaktang (29,990 ft.), Rathong (22,000 ft.), Kalru N. (24,002ft.), Kalru S. (24,000 ft.), Pandim (22,010 ft.). Chemthang was among

the intricate system of the glaciers running down from these peaks—Yalung, Talung, Onglakthong, Gocha, Zemu, and Kanchanjungha—glacier.

It was about 6 o' clock in the morning when we began the final climb to Gocha La (16,800 ft.). Kalden, a stout Sherpa, was very much enthusiastic and was eager to climb still higher up. I told him to take the ropes and crampons with him cherishing a faint hope to climb Gocha peak (20,100 ft.). Kalden took a long pole tied up with streamers of different colours with Tibetan inscriptions. We took a diagonal course leading up to a precipitous crag on the slope of Pandim beyond which lay the saddle of Gocha La. We had to get down along the vertical side of the fall, creeping and jumping over to boulders and fractures of the rocks. To avoid any serious fall, we lined up along a rope and moved down with extreme caution. This jaded our spirits. To crown our misery a grey mass of cloud suddenly appeared to be followed by. We put on snow-goggles and applied cream on the faces. The small flanks of snow were striking incessantly on our exposed skin like a sand blast. As we went further up, the wind blowed with an increasing velocity. Gocha La was then completely out of vision under thick mist. The roaring avalanches, the howling winds, the thunder and the lightning all combining presented a depressing spectacle. But the Sherpas were wonderful fellows. With one shout of Om Mani Padme Hum (Hail, the jewel in the lotus), they shook off all their mental depressions and tired feelings.

So we were still climbing, and fighting our way against enormous odds. It was snowing heavily. On the higher slopes the snows were 3-4 ft. thick and step cutting was necessary. But it was not a hard job—a few slashes with adze—end of the ice—axes were sufficient for the step. To avoid slips on the unfavourable snows it was necessary for us to go faster. But we could not, for breathing on such elevations was really difficult.

On my way to the summit, I had a few more anxious moments. Once while, I was trying to negotiate the bend of a buttress, the snow under me gave way. I tried to check myself by gripping my hands but only received a handful of snows. When all seemed lost, Kalden gave a strong pull to the rope and this ultimately saved me.

At about 11-15 A.M., I reaches the top with Kalden, Nim Temba and Ghaman, all shouting the hymn "Om Mani Padme Hum". We were completely out of breath. Recovering ourselves in a few minutes we put stones on the marking Gocha La (the Lock Pass=Guicha La) shouting all the while Tashe dele (Good luck)—as it was the custom of the Sherpas. I was in a miserable condition. My boots laked in the wet snows, and my feet grew cold. I took shelter under a huge cave of a projecting rock from which were hanging the fantastic stalactites and icicles of snow. I spent much of my time in waggling my toes about in the half frozen socks in an attempt to restore circulation. All on a sudden the mists cleared away, yielding a view of sharp crystalline ice pinnacles round the snow-field of Kanchanjungha. The faint desire to climb Gocha La peak turned into a

mad resolve. The Sherpas warned me not to take the risk in such bad weather. But I was a man inspired. My despair was gone, my confidence restored. The climb was pleasure to me then.

The lower part of Gocha was precipitous and barren of snows, only icicles clung to it. I got to the upper slope after a hard tackling over a narrow ledge of snow round the base. The intensity of the blizzard was increasing and I could hear the dreadful rumbling noise of an avalanche falling down a neighbouring ice-fall. I took the lead while Kalden followed me. We were all fitted with crampons and steadily we cut our steps through the snows. The climb was not easy, for the terrible winds were at times blowing us off our feet.

The slope was so steep that at times it seemed that our noses would almost touch the snow. At last I reached the summit and my vague dream was realised. My feeling was one of inexplicable joy mixed with a faint touch of horror. It was about 1 o' clock when we reached the summit. This made it impossible for me to stand more than a minute on the top. Moreover there was hardly any secure place to stand.

As a memento, I collected a specimen of granite from the summit. The only living creature, I was surprised to see on such height, was a marmot jumping across a small crevice. Getting back to Chemthang, we simply stretched ourselves on a carpet of colourful flowers, completely exhausted after a continuous hard job. Right above me I saw the blue sky appearing and the mists were gradually swirling under the spear shaped precipices shining sharply against the indigo blue sky. The weather cleared up, there was storm no more and the goal of our expedition was reached. With complete satisfaction we looked back—above we saw the saddle of Gocha La, a sudden U-like depression in a continuous chain of solid triangles against a deep blue canvas. Gocha Pk. (20,100 ft.) was just behind it. I was thinking —"Have I really been to the top of those peaks? Am I really a victor? Yes, but I have not a mind to enjoy the triumph because I am a victor in the sense that I have won the love of nature and felt the warmth of her bosom. We were speechless. When we got back the senses, we said nothing but shook our hands—as all was over and so, it was all quiet on the Kanchanjungha front. We lay down, enjoying the warmth of the sun's rays on our frosted skin. Temba buried himself in kindling a fire with the wet shrubs of Rhododendrons in his own ingenious way and prepared tea on a smoky fire after spontaneous blowing with the mouth. It was no tea but a liquid vapour of Rhododendron. Nevertheless it was refreshing. As we stood on our feet, we remembered that we had a home in another corner of the earth. It was the hour of parting and we bade goodbye to the valley of Paradise where the birds sing with a heavenly voice and the flowers grow with the heavenly colours. Our dream was over and the Paradise was lost. Presently, we turned south and marched back to Onglakthong.

The Meaning of the Middle Ages

JOSEPH CALMETTE*

(Translated from the French by Kamaleswar Bhattacharya—Ex-student).

The expression, *Middle Ages,* has so much entered into use to designate the millennium which opens with the great barbarian invasions and is closed with the Renaissance, that the title of this preliminary chapter may appear strange. However, it is necessary to define the meaning of the formula, and to sketch its history. Thereby will be justified the guiding principles of the *exposé* that is to follow, and the sections laid out therein.

Whoever says *middle age* evidently understands an intermediary epoch, and the very enunciation of the term shows immediately a tripartite division of time: before, during and after. To speak of a *middle* age, is to assign a final limit to a period nearer to the origins, and which can only be the *Antiquity*; it is to assign an initial limit to a more recent period, which can only be a *modern era.* Has this conception of trilogy ever been that of the historians? If it has not ever been so, when and why did it become so?

* * *

Let us note first that those whom we call "men of the Middle Ages", were, naturally, never conscious of being so; and they could not have such a feeling, for they experienced, to the same extent as ourselves, the feeling of being at the end of the previous evolution, of being "men of today". That is why—like ourselves again—they were instinctively opposed to men of old. When they spoke of their own time, they said *moderno tempore.* The people of the Middle Ages believed themselves to be and called themselves *moderns.*

It is easy to deduce from these simple statements, that the cultivated man of the medieval epoch conceived history *in* two *periods*: the Antiquity that is past, the modern times that are current.

But then, where do the modern times begin? No separation is conceivable for the believing and pious Middle Ages, if it were not under the angle of religion. The appearance of Christianity or its triumph under Constantine, can alone mark the frontier. In fact, no medieval text brings in any other criterion. Antiquity ever appears to be connected with paganism. Nowhere comes up the idea, familiar to us today, that the barbarian invasions of the 4th and 5th centuries marked a decisive turn in the destinies of the peoples.

---

* Trilogie de l'histoire de France: Le Moyen Age, Paris, 1948, Ch. I.

When, therefore, came into existence the idea, become since then commonplace? When did the vision of a triptych come to replace that of the diptych? When do we find the idea emerge, that a second stage of life in society is, in its turn, ended?

Nowhere does such a conception appear before the 15th century, but it is very significant to note, that the idea crops out and gains ground in the 15th and especially in the 16th century.[1] Giovanni Andrea, bishop of Aléria, in Corsica, future librarian of the Vatican, distinguishes, in 1469, "the ancients of the Middle Ages, the moderns of our time . . ." (*mediae tempestatis tum veteres, tum necentiores usque ad nostra tempora*). Thus an Italian scholar, at the time when Louis XI is reigning in France, realizes that a turning—and it is the question of the turning of the Renaissance—has just inaugurated a new stage in the march towards the future.

Now, the prelate was quite right. It was just the Renaissance that closed the epoch to which the people of the Middle Ages had too complacently applied the epithet modern. The true modern is the "Renascent".

The return of the flame of Antiquity, of which the "Renascent" is conscious, makes him consider as an age of transition, as a passage—even as an obscure tunnel—the time when that Antiquity, so dear, was, to his mind, unknown or misunderstood. There is no doubt about that. It was that pride of classical civilization rediscovered, that ecstasy of humanism, blossomed forth, that was rendered in the eyes and in the ear by the preciosity of a Latin, complacent with his own refinements; it was that mastery of a mature art, capable of rivalling the most glorious of the Greek masterpieces, that bubbling of new ideas, accompanied by the sudden expansion of the horizons, the conquest of the Atlantic, and ere long the annexation of an unsurmised world beyond the inviolate girdle of waves—it was this whole springtide, in short, that gave to the generation of 1500 the sensation, so live, of a second youth and of an unlimited field of progress. The starting point of that new, bold and proud idea could not be sought for elsewhere. After Antiquity, there was a period of gestation and elaboration; but now is the emergence of a humanity, redeemed, resteeped in a disinterred Antiquity, fully and better understood. In any case, the very word, *Renaissance,* precisely expresses that sensation of a revival, an *élan,* a rising vigour, a new life.[2]

Joachim Von Watt in 1518, John Heerwagen in 1532, Hadrianus Junius in 1575, use expressions like the following: *medium aevum, media aetas, media tempestas,* that is, literally, Middle Ages, to designate the most immediate

[1] See, thereupon, G. L. Burr, *How the Middle Ages got their name,* American Historical Review, XIX - XX, and the remarks of Ferdinand Lot, *Histoire du Moyen Age,* I, p. 1, of the Introduction (*Histoire générale* of Gustave Glotz). See also Giorgio Falco, *La polemica sul Medico Evo,* I, Turin, 1933 (Bibliotheca della Societa storica Subalpina, CXLIII).

[2] Falco, I, p. 406, n. 1, points out the exaltation of the Renaissance as the starting point of the idea of the Middle Ages. The quotation from Giovanni Andrea, a little above, is drawn from a letter to the Cardinal Nicolas de Cues (Burr, *loc. cit.,* pp. 813-814).

past. Beyond the 16th century, in the 17th, we find, from the pen of scholars like Canisius, Goldast, Voss and Horn, equivalent phrases, to indicate the millennium that preceded the triumph of humanism, not to speak of Du Cange, whose celebrated *Glossarium mediae et infimae latinitatis* (1678) evokes the same fundamental idea.

Let us not be involved, however, in a fallacy. The idea is still but an idea of scholars. It has not entered into the domain of current notions. As a matter of fact, it will not enter into it a long time still.

In his famous *Discours sur l'histoire universelle,* which appeared in 1681, Bossuet has not yet any surmise whatsoever of a medieval epoch. Antiquity he considers as proceeding down to Charlemagne, after whom the modern era starts. The same vision of the past is betrayed by Voltaire writing, in 1756, his *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations.*[3] And the great encyclopaedic works of the last of the classical centuries—*Dictionnaire de trévoux* and *Encyclopédie* of Diderot, especially—follow the same tradition.

Thus, the spell of the Renaissance once past, the idea it had given rise to seems to have evaporated. The division, one would say, was not decisive. As time passed, the impression seems to have been attenuated—the impression, perhaps too presumptuous, of those who had tasted so voluptuously the inebriating waters of the fountain of Youth.

But as distance in time increases, the first impression comes back. Classicism is the offspring of humanism. It repudiates the "Gothic", but the Romanticist unveils it anew and reinstates it. The Middle Ages, despised for a time, find back their dignity and their poesy. In the end, how to represent the curve of time? The thought of the historians gropes in the dark and seeks itself. A last hesitation is still betrayed at the end of the Restoration: Guizot professes, from 1828 to 1830, a course, which makes sensation in Sorbonne, under the title: "History of civilization since the fall of the Roman Empire". Now, from 1828 onwards, his lectures appear under the heading: "Lectures on modern history". On the other hand, in 1829, Ovide Chrysorthe Desmichels, rector at Aix, publishes a "General History of the Middle Ages"—a characteristic title opening up some clear perspectives.[4] At last, the game is won. In 1838, the academic programmes finally authorize that expression—Middle Ages—which, ten years before,

---

[3] Falco, I, 108, notes that the *Essay,* XI, 64, p. 508 of the 1878 edition of the *Works* of Voltaire, uses the expression *Middle Ages* in passing, but identifying it with the sstruggle between the Priesthood and the Empire. J. Bryce, The Holy Roman Empire, 8th ed., London, 1892, makes the modern era start with Charleragne. See, in Falco, the formation of the idea of the Middle Ages among the historians, even when the expression has not yet acquired the right of city.

[4] Vol. I (Paris, Colas) openes with a chapter on "the decadence of the Roman Empire." The work was not pushed farther than Vol. II, stopped at 888. Already, in 1823, the author had published a manual under this title: *Tableau chronologique de l'Histoire du Moyen Age,* and in 1827, a short history of the Middle Ages, starting with the first crusade. It is evidently through the works of the rector of the Academy of Aix, that the expression Middle Ages penetrated the pedagogic spheres.

Guizot himself seemed to ignore or repudiate. Henceforth, the expression will be constant, official and ineradicable.

We have further to note only some oscillations as to the starting point or to the closing point. The starting point is situated at the time of the invasions, more often than not at the death of Theodosius, in 395, or rather at the fall of the last Roman Emperor in 476, and the final limit, after having for a long time been fixed at the capture of Constantinople by the Turks in 1453 —to which Giovanni Andrea would have subscribed without hesitation— is rather today more judiciously brought over to 1492.

* * * *

It remains to know if the tripartite division of time, implied by the notion of the Middle Ages, is justified in reason. And, in the first place, is there truly, between antiquity and the modern era, an intermediary epoch?

An objection at once presents itself. To envisage an epoch as *intermediary,* is, whether one wants it or not, to qualify it as an *epoch of transition.* But, is not every epoch in transition? One might say of history what used to be said of nature before the discovery of the "discontinuous": *non facit saltus.* Good sense claims its rights. Which century is not a passage between that which precedes it and that which follows? The most brilliant epochs of civilization—be it the epoch of Pericles, or of Louis XIV —are no exceptions. The 17th century, of which France is justly so proud, is no less that which led her from the Rebelaisian freshness of a Henry IV, to the exquisite refinements of the Regency. And if every epoch is essentially transitory, the historic life, like individual life, flowing without interruption in the homogeneous process of time, do we not either *say nothing* or utter a vain and dangerous *tautology,* when we speak of an intermediary epoch, a *middle* age? For, every age is a middle age, and we ourselves shall one day be considered as medieval by our successors.

It is true, and we candidly acknowledge it. Nevertheless, the refutation is not so pertinent as it may appear at the beginning, nor so decisive as it seems to be, at first sight. If there really exist, between *Antiquity* and the *Modern Times,* fundamental contrasts, and if the millennium that separates those two stages, prepared the transition from one of those stages to the other, then the expression, *Middle Ages,* assumes a profound sense and corresponds to a substantial reality.

Now, that precisely is the case; and this is what we shall elucidate as far as possible.

* * *

Let us consider the appearance of the ancient world. None has better than Bossuet understood and formulated its law. It is a succession of dominations that cover one another and are absorbed one in the other.

The Egyptians, Assyrians, Medes and Persians replace one another in the envied rôle of the leading people. Greece joins gloriously and reigns with her genius. Rome, at last, builds up the largest of the ancient empires, and realizes literally the dream of the conquerors from Ramses to Alexander, who have endeavoured to raise themselves to omnipotence. Has not a total domination of the world, called civilized, crowned the pride of the people-king? From Augustus to Constantine, a Graeco-Latin culture, seated around the Mediterranean—*mare nostrum*—unfolds itself, proud both of its brilliance and of its extent. Rome beats the rhythm of the universe: *orbis romanus.* The unity of *Romania* seems to be decidedly the formula of a full-grown and superior humanity whose ideal is attained: Unity as well as perenniality. Rome is the eternal city. All that is outside this unity is barbarism. The Empire is naturally deified, when it means Civilization. The Emperor is naturally deified when he presides, in his majesty, over this sovereign and perfect form of social life.

Now, triumphant Christianity adds still more to that consciousness of Roman superiority: the Rome of Peter is, even more than the Rome of Augustus, the universal capital. Christian, the Empire becomes, as it were, still more divine and sacred. No wonder, therefore, that the barbarian invasions, which seem to us to bring about the condemnation of the Empire and of the unity it represents, do not at all appear under that catastrophic aspect to the men of the 4th and 5th centuries.

Indeed, the generations, both preceding and following the invasions, are conscious of the decadence and of the humiliations it brings about; they feel severely the effects of the crisis that breaks out and torments society. But its real consequences, they by no means perceive. These generations submit to those humiliations, those damages and those crises, as we suffer misfortunes and crises that happen to us. None has the intuition that a world has perished, still less that an era is closed.

Now, the imperial decadence, the crisis of the *orbis romanus,* the entry and installation of the Barbarians in Roman territory subvert the whole political and social status. A new status is in gestation in this chaos, which, like the chaos preceding creation in classical mythology, bears in it a substantial blossoming of the future.

Surely, the *decadence* of the Roman world has always been placed by the historians at the starting point of the transformations that marked the epoch of the *Low Empire;* but hardly any care was taken, formerly, to scrutinize the concrete tenor of that notion of "decadence". One instinctively clung to the fine, sonorous phrases of the contemporaries themselves, to the vituperations particularly of the Fathers of the Church, severe to the "age" and as much eloquent in denouncing its vices as little precise in defining the causes and characteristics of that "corruption" which they denounced. We needed the patient, meticulous analyses of scholars, especially the intervention of the economic considerations, to penetrate that complex but capital

phenomenon, which, in the annals of the West, this essential fact has been, viz., the invasions of the 4th and 5th centuries.

It is not solely the disappearance of the military sentiment, undermined by a long peace, but perhaps more still the economic collapse of the Latin West, which has weakened the Empire. The West consumes more than it produces. Peopled by the rich, who maintain their luxury at the expense of general economy, and by official out-of-works, who live at the expense of the community—*panem et circenses*—Rome consumes without counterpart. The East is the purveyor. The one-way current of gold, which flows incessantly towards the East, is the tangible sign of that deficit balance; the successive devaluations, hoardings, slumps, so many concordant evidences. Neither stable, movable wealth, nor organized credit, but it is the more and more exclusive predominance of landed wealth, of life more and more rural and local.

A rural and local life—already almost manorial, let us say—is outlined even before the great invasions, and explains them. Becoming a landholder to this extent, the West changes its character and its structure.

Now, when a society is under a profound transformation of its economy, a malaise springs up and rapidly becomes intolerable. This malaise is quite precisely felt through the witness of the great invasions. The invasions, in their turn, accentuate and accelerate the evolution. One proceeds ever more towards a rural and local life. Abatement of the commercial currents, difficulties of communication, adaptation of the barbarians to agricultural labour, all contribute to it. That is why, when the last emperor, Romulus Augustulus, with the double name symbolically ludicrous, is overthrown in Rome, when the imperial insignia are sent away to Zeno, who reigns at Constantinople, by the Herul Chief, Odoacer, in 476, the barbarian kings become *sui juris,* that is to say, independent. /mmediately, instead of the Roman provinces, which were expressions of unity, one sees being set up, in the ancient West, as expressions of plurality, kingdoms of recent date: Merovingian France, Visigothic Spain, Ostrogothic Italy.

How is it that the contemporaries were not struck, as we are, by those prodigious changes, unity giving place to plurality, and multiple states being set up where largely stretched an Empire?

The characteristic fact is that this contrast was not perceived or was perceived only vaguely and fugitively. The notion of the Empire, though perished in fact, lived intact on the plane of pure idea. And this ideological survival was so strong, that it led to the imperial restoration of Charlemagre, to the coronation of a successor of Romulus Augustulus in Rome, on the Christmas-day of the year 800 A.D.

But the 9th century passed, and this century, unitarian at its dawn, ends in the twilight of confusion and disintegration. Charlemaghe had no successor worthy of him. His work, which, in other respects, will leave

impressive survivals, is sunk in disaggregation. Occasional causes? Indeed. The study of the reign of Louis the Pious shows what a great harm to unity was done by the conflict of parties and the clash of individual interests. But there were profound causes, too, and especially economic causes.

Economy and polity evolve, in fact, with difficulty, one in the contrary direction to the other. Now, this was the case in the 9th century. Politically centralizing and unitarian, the Carolingian State wwas able to restore the imperial form to the West. But it lived under the shadow of a localized economy. Neither the wars nor the conquests, neither diplomacy nor the vast conceptions of the literati, changed anything in the material practices of daily life. Nothing was modified in the distribution of wealth, the circulation of money, the rhythm of exchange, and the contingencies that fix the values of things and condition the relations between men. It has been said with reason, that the Carolingian Empire, though a great political power, was not a great economic power. The West must adapt itself to the closed economy; and the more so because the Mediterranean axis was broken, precisely at that period, by the Arab pressure. That is why, as has been shown by the great Belgian historian, Henri Pirenne,—though not without some exaggeration,—the Carolingian life, even more than the Merovingian life, was a life *on the spot*: no towns, but only self-sufficient rural domains; really, one might say, an autarky, and what is more, a village autarky.

A localized life, a social evolution, whose outcome is outlined and will be of the feudal type: how could such an economy, with a centrifugal force, be reconciled with the political concept of unity? One of those two contradictory tendencies must win; either economy must reopen, or the unitarian edifice must collapse.

Now, it lies in nobody's power to reopen the closed economy. It is, therefore, the second hypothesis that is proved, and is expressed on the map and in the facts, by the seigniorial dismemberment.

And nevertheless, thought cannot reconcile itself with this shipwreck of a dear Utopia. The divided Middle Ages thirst for unity. They look for it everywhere: in a revival of the imperial ideal, in the religious notion of the Christendom, symbolized by the *seamless tunic*—a double realization, civil and religious. It is this nostalgia of unity, that explains how breathlessly attentive the medieval world was to the thrilling Quarrel of Investitures, how emotionally it followed the struggle between the Emperors and the great Popes, who, from the 11th to the 13th century, disputed the leadership of the world.

Now, while the two rival powers exhaust themselves one against the other in search of an impossible victory—and impossible precisely because the unity, which is the stake of battle, is illusory and doomed—the facts continue to explicate themselves in a direction far from the mystical. A new world, rejected by the spirit, but imposing itself on reality,—is outlined and modelled, decidedly victorious from the 13th century onwards.

Economy changed its direction at the turning of the 11th—12th century. The recovery of the Mediterranean by the Christians, through the great impulse of the pilgrimages of the East and the Crusades, the formation of a *bourgeoisie,*—a new class devoted with tenacity to commerce and industry, —in short, a conjunction of circumstances of a marvellous opportunity takes place, and autarky gives place to a new economy—an economy which tends towards capitalism and international exchange. At the same time, the political current, out and out feudalized in the 9th and 10th centuries, submits to a new aspiration, an irresistible force of polarization; the centralized tendency prevails again and succeeds to the seigniorial tendency. But led by kings, this new evolution tends towards *unities* and not towards *a unity*. It goes towards the formation of monarchies, that is to say, the constitution of States, juxtaposed on the map. Ultimate consequence of the invasions? There is no doubt about that. In any case, behind the kings, there are peoples. Each of them has acquired a consciousness. Everywhere in the West, the nationalisms fuse and emerge. The 14th century witnesses their brilliant assertion. France and England, at grips in the terrible and prolonged trials of the "Hundred Years' War", have found in the dramatic peripetias, where their indomitable wills confront each other, the occasion of feeling their own individualities vibrate. Opposed to England and France, henceforth grown-up, there is a Spain, whom the painful *reconquista,* reacting against the Moors, has similarly endowed with a live sense of her personality; an Italy, who, in the absence of a territorial coherence, opposes her radiant and proud culture to the brutality of the "Barbarians"; finally, a Germany, whom the growing House of Austria begins to give the prescience of the rôle she would be able to play.

A Europe is born,—a Europe composed of powers who intend to be limited reciprocally and to secure themselves against one another, to assert on all the respect for their existence, their vital interests and their dignity. No longer is unification possible. No longer a triumphant imperialism. One willing to dominate will find, in a coalition of adverse forces, the peril as well as the punishment of one's temerity. The Plurality, slowly elaborated, has won; and the the world, tired of seeking for peace in a unity of irrealizable and perhaps undesirable domination, has no other alternative than to wait for it from an equilibrium of force, from which might emerge the respect for rights and liberties, the generator of a tranquil harmony.

Let us conclude. Through the transformations of which we have outlined the schema, a truly transitory epoch may be situated. Between those two aspects of the world,—ancient unity and modern plurality,—the medieval millennium prepared the transition. Through the hesitations and through the multiple turnings of a long route, the "men of the Middle Ages" fulfilled their mission. It is because it led us definitively from one of those extremities to the other that this *middle* age was truly an age of transition. The effulgence of the great centuries of which this millennium may justly be proud,

—the very effulgence of the great 13th century, that sovereign epoch of Saint Louis and Saint Thomas, which may be compared with the most glorious epochs in the human annals,—those of Pericles, Augustus or Louis XIV,—nothing contradicts the general character of that succession of centuries, which, by fits and starts, goes from the decadent Empire to organized Europe. There is legitimately a *middle age,* and the rôle of this *age,* in the *ensemble* of history, appears both clearly defined and indispensable for the harmonic vision of the curve of time.

Jogish Chandra Sinha*

(By an ex-student)

Dr. Jogish Chandra Sinha, the distinguished economist and economic historian whose death in an accident was reported from Calcutta a few months back, belonged, as one of its brightest, to that galaxy of talents which is the unique contribution of Presidency College to the cultural life of this country. Entering this college at the age of sixteen, he graduated with the highest academic distinctions, including the Eshan scholarship in 1913 and took his M.A. degree with equally brilliant results two years later. As a student he came into close contact with Sir Jehangir Coyajee, the doyen of Indian economists in his time and Professor R. N. Gilchrist, formerly of Aberdeen University, both of whom were highly impressed by his originality of thinking and scientific attitude to the problems of social and economic life. Young Jogish Chandra was a voracious reader and an indefatigable research worker. How high his reputation as a student had grown would become evident from the fact that immediately after the publication of his results in the M.A. Examination, he was called upon to join the University of Calcutta as an assistant to the Minto Professor, who was also at that time the Head of the Department, of Economics. The confidence of his teachers in his abilities was not misplaced. Within a short period he made his services indispensable and was elected to a permanent lectureship in the University. For about eight years he lectured and worked here, initiating almost singlehanded a number of important research projects including a painstaking survey of Indian Commerce spreading over a period of about five decades (1765-1813). Four years' work on this and other allied aspects of Indian economic history enabled him to prepare his thesis for the

---

* Born 2nd May, 1893 in Poradah, Dt. Nadia, died 10th May, 1954.

Premchand Roychand Scholarship examination. This work was completed in 1923.

About this time a second University for Bengal was being founded in Dacca and the authorities were on the look-out for a suitable man who could organise and run the Economics Department. And this scintillating young lecturer now barely in his thirties—too young as yet to be dignified as a Professor, although eligible as a Reader—found himself to be the obvious choice for the post. Jogish Chandra's sojourn at Dacca lasted for nearly a decade, interrupted by a trip to England in 1928. During his stay in Dacca, he not only managed to build up an efficient department of Economics with the help of his able colleagues in that University; he also continued to work hard at his rich store of materials on the economic life of Bengal since the British conquest. The results, deliberately aimed at counteracting currently held opinions on Indo-British economic relations in many cases supported by 'dilettante research' (the term was his), were published in 1927.* Though Jogish Chandra did not attempt at forging new tools of historical analysis, his patient collection of facts and unwavering allegiance to verifiable truth, made his work a model for future workers in the field. The year this book was published, Jogish Chandra was admitted to the Ph.D. degree of the University of Calcutta.

After an absence of nearly sixteen years Dr. Sinha returned to Presidency College in 1932 as Senior Professor Economics and Politics. Though he came back as a Professor, the student in him was very much in evidence during the long eighteen years that he remained with us—one easily remembers the shy, almost adolescent, smile on his face—skilfully guiding the economics department and, on two occasions, the college administration as the officiating Principal. When Dr. Sinha took charge of his new post, his major work on economic history was already complete and his reputation as a scholar and teacher securely built up. Like so many other men with a similar background, he might now relax and rest on his oars. But Dr. Sinha's spirit of enquiry led him again and again to explore new fields of work. The erstwhile academic historian of economic events emerged in these years as a keen student of contemporary monetary and financial problems. Already in 1926 he had evinced his interest in these subjects by submitting a learned memorandum to the Royal Commission on Indian Currency and Exchange and in an article published in the Banker's Magazine of London in 1929 he had given evidence of his keen interest in the problems of rural banking. Throughout India at this time exhaustive banking enquiries were being undertaken by the Provincial Governments and the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee had Dr. Sinha, the leading economist in the province, as one of its members. Not only in India but all over the world monetary and financial problems were being discussed and debated with a

* Economic Annals of Bengal, Macmillan, 1927.

vehemence that would surprise the economists of this generation; puzzled by the great depression the economists had almost instinctively turned towards money as the real offender behind this misdemeanour of the economy. Financial institutions were being subjected to close scrutiny and monetary reorganisation seemed to be the real need of the hour.

It is no wonder that Dr. Sinha would feel drawn to these problems, though it is surprising how he managed to keep himself free from some of the grossest blunders committed by the monetary enthusiasts of the period. The Ratio controversy which seemed at times to imply that currency derangement was solely responsible for all that India was suffering from in the depression years, prompted Dr. Sinha to bring the whole subject under rigorous statistical analysis and, subject to the normal limitations of such analysis, he was able to prove convincingly that enthusiasm in support of one or other of the ratios had run ahead of reason. The tools that have been applied in later years for the discussion of such problems were not yet ready. But Dr. Sinha's instinct as a trained economist and the facility he had acquired in handling historical data saved him on the one hand, from accepting readymade conclusions and led him, on the other, to test such data as were available with the accepted measuring devices of the time. His Kikabhai Premchand Readership Lectures delivered at the Delhi University in the winter of 1937-38 helped to establish his position as one of the foremost scientific thinkers on monetary problems. The lectures were published in the form of a book* which remains, until today, as the most dispassionate analysis of the monetary problems of a troubled decade in the history of the country.

Along with his interest in monetary problems, which he shared with many other economists of the period, Dr. Sinha continued to maintain his intimate acquaintance with the economic life of the province of his birth, a subject in which his knowledge was almost unparalleled. His writings on the subject are many and scattered, but Bengal's foreign commerce, especially in Jute, seemed to attract him with an irresistible spell. He was a member of the Jute Enquiry Committee of 1933 and his unrivalled knowledge of Bengal's trade and commerce was of invaluable help to the deliberations of the Committee. He could not see eye to eye with the other members and his recommendations regarding improved methods of marketing raw jute did not win the approval of the dominant industrial and trading interests. But the important Minute of Dissent he wrote in this connection reveals his integrity and a keen, almost personal, interest in the well-being of the jute-grower.

Dr. Sinha's reputation as an economist had now travelled beyond academic circles. The Government of Bengal and the Government of India often approached him for consultation on economic matters. From 1943 to

* Indian Currency Problems during the Last Decade (1926-36), Delhi University 1938.

1946, Dr. Sinha was a member of the Consultative Committee of Economists constituted by the Government of India during the Second World War. He was also a corresponding member of the Indian Historical Records Commission.

In 1948 came the crowning honour of his career. The Indian Economic Association elected Dr. Sinha to its Presidentship for the year. The Presidential address, delivered at the annual Conference of the Association in Hyderabad, was a masterly survey of the post-war economic trends then manifesting themselves in an open and uncontrolled inflation. Dr. Sinha attempted to assess and measure, if possible, the inflationary potential in the country (much of which, he believed, was black-market money) and suggested a number of remedies for the consideration of the authorities.

His connection with Presidency College formally came to a close in 1950 when he retired from the Government Educational Service. But he continued to take active interest in the affairs of the College. The economics department in particular had several occasions to seek his advice and co-operation even after his retirement. His connection with post-graduate teaching in the University of Calcutta was severed only by his death.

Dr. Sinha's health was failing towards the latter part of his life. His eye-sight had also deteriorated. But he maintained his reading habits and a few months before his death he had indicated, in private conversation, his desire to collect materials for writing out a comprehensive economic history of the country. Death, however, overtook him suddenly. While taking his morning stroll he was run over by a motor vehicle and died the same afternoon of his injuries.

In his personal life Dr. Sinha was a modest and lovable man who had a smile for every casual acquaintance and a warm heart for friends. To his students he might at times appear aloof but this impression would require little time to be reversed if they would have occasion to meet him outside the lecture-room. Dr. Sinha's contribution to the building up of a whole generation of students of economics in Bengal—he was a teacher in both the Universities of Bengal for a total period of thirty-five years—is not the least of his life's achievements. The public will remember him as a leading economist of the period; his students will fondly remember him as their beloved teacher.

LIST OF CONTRIBUTIONS

(a) *Books*—

1. The Economic Annals of Bengal (Macmillan, London, 1927).
2. Indian Currency Problems During the Last Decade (Delhi University, 1938).

(b) *Articles in Journals*—

1. Indian Guilds—Bengal Economic Journal, September, 1918.
2. History of Indian Commerce (1765-1813), in Sir Asutosh Mukherjee Silver Jubilee Volumes, (Calcutta University, 1921).

Founders' Day of the College. On September 22, some members of the Association staged Sri Bidhayak Bhattacharyya's "Taito" at the Calcutta University Institute. The performance, which rose to the high standards people have learnt to expect of the Alumni Association presentations, delighted everybody. The members of the Association met at an informal Tea on the 4th December on the College lawn. The function, which was the last of the year, was well attended and everybody enjoyed the very pleasant and informal atmosphere characteristic of all the Alumni Association gatherings.

As we are going to press, we learn with the deepest regret of the sudden death in England of Mr. Arthur Humphry House, sometime Professor of English at this College. A first-class greatsman of Oxford, Mr. House came out to this College early in 1936 as Professor of English on special pay. He resigned his appointment in a year's time because he disliked British rule in India and because, as he said in his characteristic manner in his valedictory address to his students and colleagues, he felt that he was being paid more than he deserved. That remark of his and the way he threw up a well-paid Government job because it clashed with his principles, show the spirit of the man. To a Government offer of increased salary and allowances he returned a firm 'no'. On resigning his post here, he took a part-time appointment at a local non-Government college and another at the University. During the two years or so he was in Calcutta, he won golden opinions both as a scholar and as a man. Few Englishmen who have come out to India have identified themselves so whole-heartedly with Indian life and the Indian point of view as Mr. House did; never for a moment did he let the people around him feel that he was a foreigner belonging to the then ruling race. On return to England, Mr. House had the distinction of being appointed Clark Lecturer at Cambridge, and for the last few years he was Senior Research Fellow at his old college at Oxford, Wadham, and also University Lecturer in English. He was a fine scholar and critic, and made a number of notable contributions to English studies. He had been editing the letters of Dickens when the end came suddenly. We offer our respectful homage to the memory of our late Professor.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

1914-15	JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A.
1915-16	PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1916-17	PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1917-18	RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
1918-19	MAHMOOD HASSAN, B.A.
1919-20	PARAN CHANDRA GANGOOLI, B.A.
1920-21	SHYAMA PRASAD MOOKERJEE
1921-22	BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
1921-22	UMA PRASAD MOOKERJEE
1922-23	AKSHAY KUMAR SIRCAR
1923-24	BIMALA PRASAD MUKHERJEE
1924-25	BIJOY LAL LAHIRI
1926-27	LOKES CHANDRA GUHA ROY
1927-28	SUNIT KUMAR INDRA
1928-29	SYED MAHBUB MURSHED
1929-30	AJIT NATH ROY
1930-31	AJIT NATH ROY
1931-32	NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1932-33	NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1933-34	GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
1934-35	SUDHIR KUMAR GHOSH
1935-36	PROVAT KUMAR SIRCAR
1936-37	ARUN KUMAR CHANDRA
1937-38	RAM CHANDRA MUKHERJEE
1938-39	ABU SAYEED CHOWDHURY
1939-40	BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
1940-41	PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
1941-42	GOLAM KARIM
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	JIBANLAL DEV
1947-48	NIRMAL KUMAR SARKAR
1948-49	BANGENDU GANGOPADHYAY
1949-50	SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY
1950-51	MANAS MUKUTMANI
1951-52	KALYAN KUMAR DAS GUPTA
1952-53	JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI
1953-54	PRADIP KUMAR DAS.
1954-55	PRADIP RANJAN SARBADHIKHARY.

Printed and published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press Ltd.,
5, Chintamani Das Lane, Calcutta-9.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	Pramatha Nath Banerjee, B.A.
1915-16	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1916-17	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1917-18	Saroj Kumar Das, B.A.
1918-19	Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20	Mahmood Hassan, B.A.
1920-21	Phiroze E. Dastoor, B.A.
1921-22	Syama Prasad Mookerjee, B.A.
1921-22	Brajakanta Guha, B.A.
1922-23	Uma Prasad Mookerjee
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta, B.A.
1925-26	Asit Krishna Mukherjee, B.A.
1926-27	Humayun Z. A. Kabir, B.A.
1927-28	Hirendra Nath Mukherjee, B.A.
1928-29	Sunit Kumar Indra, B.A.
1929-30	Taraknath Sen, B.A.
1930-31	Bhabatosh Datta, B.A.
1931-32	Ajit Nath Roy, B.A.
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar, B.A.
1933-34	Nikhilnath Chakravarty, B.A.
1934-35	Ardhendu Baksi, B.A.
1935-36	Kalidas Lahiri, B.A.
1936-37	Asok Mitra, B.A.
1937-38	Bimal Chandra Sinha, B.A.
1938-39	Pratap Chandra Sen, B.A.
1938-39	Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin, B.A.
1940-41	Manilal Banerjee, B.A.
1941-42	Arun Banerjee, B.A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	Sudhindranath Gupta, B.A.
1948-49	Subirkumar Sen, B.A.
1949-50	Dilipkumar Kar, B.A.
1950-51	Kamalkumar Ghatak, B.A.
1951-52	Sipra Sarkar, B.A.
1952-53	Arun Kumar Das Gupta, B.A.
1953-54	Ashin Das Gupta, B.A.
1954-55	Sukhamoy Chakravarty, B.A.